Vol. 53 | No. 1 | 2015

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলাদেশের নাটকে রাজনৈতিক ও সামাজিক চৈতন্য

Volume	53
Issue	1
Year	2015
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	ফারহানা আখতার
Published online	October 1, 2015
DOI	10.62328/sp.v53i1.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v53i1.3
Pages	৩৯-৭৮
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বাংলাদেশের নাটকে রাজনৈতিক ও সামাজিক চৈতন্য (১৯৪৭-২০০০)

ফারহানা আখতার*

এদেশের মুক্তিকামী মানুষ মনে ও মননে চিরকাল বিপ্লবী চেতনার অধিকারী। পরাধীনতার বিরুদ্ধে তারা থেকেছেন উচ্চকণ্ঠ। সমাজ পরিবর্তনে এদেশের সংস্কৃতিকর্মী ও নাট্যকারদের প্রতিবাদী ভূমিকা অনস্বীকার্য। শোষণ-নির্যাতন, অত্যাচার-অনাচারের বিরুদ্ধে তারা তাদের বিদ্রোহী অভিমত প্রকাশ করেছেন নাটকের মাধ্যমে। অন্যদিকে, সমাজের নানা বৈষম্য, দুর্নীতি, অশিক্ষা, অসাধুতা, কুসংস্কার, মূল্যবোধহীনতাকে আশ্রয় করে সচেতনতা সৃষ্টির অভিপ্রায়ে সমাজ-সমালোচনামূলক নাটকও সমাজ-চৈতন্য নির্ভর নাট্যধারায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

১৯৪৭-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ, ব্রিটিশ উপনিবেশ হতে মুক্ত হয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের ঔপনিবেশিক শোষণ, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র, আক্রমণ ইত্যাদি অভিঘাত এদেশের মানুষকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে এবং সমাজ-সচেতনতামূলক ভিন্ন ধারার নাটক রচনায় অনুপ্রাণিত করে। তাছাড়া, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীভৎসতা, ৪২-এর আগস্ট আন্দোলন, যুদ্ধোত্তর হতাশা, গ্লানি, মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, ৪৩-এর দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ, ইংরেজ-বিরোধী আন্দোলন ইত্যাদি অনুষঙ্গ সমাজ-ভাবনার পরিবর্তনে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরিবর্তিত জীবনভাবনা, সমকালীন সংকট বিষয়ে নাট্যরচনায় তখন নাট্যকাররা উৎসাহী হলেন।

১৯৭১-পরবর্তী সময়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাংলাদেশের সত্তর ও আশির দশকের নাটকের মূল সুর ছিল বলে স্বাভাবিকভাবেই নাটকের ভাব ও ভাষা ছিল আবেগমথিত। শিল্প নয়, বরং ইতিহাসের প্রামাণ্য দলিল হিসেবে নাটকগুলো পেয়েছে অধিকতর গ্রহণযোগ্যতা। স্বাধীনতার পর এদেশের মানুষের সমাজতান্ত্রিক সমাজের স্বপ্ন অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ভূলুণ্ঠিত হয়। উপরন্তু মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ক্রমশ হারিয়ে যাওয়ায় সামাজিক অনাচার বৃদ্ধি পায়, যার প্রতিচ্ছবি দেখা যায় সমকালীন নাটকগুলোতে। সমালোচকের দৃষ্টিতে :

---

*সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

> সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, বেকারত্ব, শাসকগোষ্ঠীর ছত্রছায়ায় জনগণের সম্পদ লুটপাট-আত্মসাৎ, সরকারের নিয়ন্ত্রণহীন, অবৈধ অস্ত্রের ঝনঝনানি, প্রতিশোধ-পরায়ণতা, হিংসা-প্রতিহিংসা, হত্যা, গুপ্ত হত্যা, ঘুষ, দুর্নীতি, ছিনতাই, ডাকাতি, অর্থনৈতিক শোষণ-বঞ্চনা, শ্রেণিবৈষম্য, শ্রেণিসংগ্রাম, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, সন্ত্রাস-নৈরাজ্য, কালোবাজারি, চোরাকারবারি, মজুতদারি, যুবসমাজের হতাশা, মুক্তিযোদ্ধাদের বিপথগামিতা, হত্যার মধ্যে দিয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পালাবদল, কলংকিত সামরিক শাসন ও সামরিক শাসনকালের অবক্ষয়িত সমাজচিত্র, স্বাধীনতা বিরোধীদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় উত্থান, মুক্তিযোদ্ধাদের অবজ্ঞা, অবহেলা, নির্যাতন, নির্বাসন, হত্যা প্রভৃতি সঙ্কট অনেক যুদ্ধফেরত বিক্ষুব্ধ তরুণ নাট্যকারদের আন্দোলিত করলো নাটকের বিষয়বস্তু নির্বাচনে। (মো. জাকিরুল হক, ২০০৭ : ৯৫-৯৬)

অর্থাৎ, সমাজের জটিল ও গভীর সঙ্কট বিষয়বস্তু হয়ে স্থান পায় নাটকে। সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন ও অঙ্গীকার নিয়ে রচিত হতে থাকে এই ধারার নাটক। নির্ভার ভবিষ্যতের ভাবনায় উদ্বেলিত এসব নাটকের মাধ্যমে নাট্যকাররা জনগণকে অধিকার সচেতন করতে চান, তাদের চিন্তা ও কর্মের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে চান। এই ধারার নাটকগুলোকে নিম্নোক্ত দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় :

১. প্রতিবাদ ও প্রতিরোধমূলক নাটক

২. সমাজ-সমালোচনা ও সচেতনতামূলক নাটক

১. প্রতিবাদ ও প্রতিরোধমূলক নাটক

১.১ বিভাগোত্তর পর্ব

বাঙালির জাতীয় জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা ১৯৫২-এর ভাষা-আন্দোলন। দেশবিভাগের পর থেকেই শাসকগোষ্ঠী এদেশের ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর যে বিরূপ আচরণ শুরু করে তার বিরুদ্ধে ছাত্র, শিক্ষক, লেখক, বুদ্ধিজীবীসহ সর্বস্তরের সচেতন মানুষ সোচ্চার হয়ে ওঠে। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ছাত্রজনতা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ভাষার দাবীতে মিছিল নিয়ে এগিয়ে গেলে তাদের ওপর গুলি চালানো হয়। সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারের রক্তে ভিজে যায় রাজপথ। সারা দেশ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। জীবন দিয়ে বীর বাঙালি জাতি আদায় করে নেয় ভাষার অধিকার, নির্মিত হয় শহীদ মিনার। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করলে বাঙালি জাতির মৌলিক অধিকার আবারও হুমকির মুখে পড়ে। বাঙালির আন্দোলন অব্যাহত থাকে। কেননা, রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে মেনে নিলেও এদেশের সংস্কৃতির বিরুদ্ধে শাসকদের ষড়যন্ত্র থেমে থাকেনি। ভাষা-আন্দোলনের ফলে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ দুর্বল হয়ে পড়লে সক্রিয় হয়ে ওঠে বাঙালি জাতীয়তাবাদ যা বাঙালির সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে জাগ্রত করে। ১৯৫৮ থেকে

১৯৬০ সাল পর্যন্ত সামরিক স্বৈরশাসনের ত্রাসে সারাদেশে বিরাজ করে বিভীষিকাঘন পরিবেশ। ১৯৬১ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবসকে কেন্দ্র করে মুক্তিকামী বাঙালি জনতা আবারও আন্দোলনে ফেটে পড়ে। একই সালে রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনকে কেন্দ্র করে সামরিক স্বৈরশাসকের আশীর্বাদপুষ্ট, পাকিস্তানি চিন্তা-চেতনায় বিশ্বাসী প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক লেখকগোষ্ঠী এবং রবীন্দ্রভক্ত আধুনিক ও প্রগতিশীল শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। ফলে সামরিক শাসকের ইঙ্গিতে বাহান্নর ভাষা-আন্দোলনের ফসল বাংলা একাডেমিতে রবীন্দ্র-জন্মবার্ষিকী উদযাপিত হয়নি। তবে প্রগতিশীল লেখক, শিক্ষক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী, বিচারপতিগণ এই ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, নিন্দা জানিয়েছেন। এঁদের মধ্যে মুহম্মদ কুদরত-ই-খুদা, কাজী মোতাহার হোসেন, বেগম সুফিয়া কামাল, জয়নুল আবেদীন, মুহম্মদ আবদুল হাই, মুনীর চৌধুরী, শহীদুল্লা কায়সার, বিচারপতি মুরশেদ প্রমুখের নাম স্মরণীয়। সরকারি বিধি-নিষেধ অমান্য করে তারা চার দিন ব্যাপী রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন করেছিলেন। এভাবে বাংলা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির ওপর যত আক্রমণ চালানো হয় ততই বাঙালি জাতির প্রতিবাদী চেতনা গভীরতর এবং তীব্রতর হয়ে ওঠে– যার প্রভাব সঙ্গতভাবেই নাটকের ওপর পড়েছিল।

ভাষা-আন্দোলনের পটভূমিতে ১৯৫৩ সালে রচিত হয়েছে মুনীর চৌধুরীর (১৯২৫-১৯৭১) শিল্পোত্তীর্ণ নাটক *কবর* (১৯৫৩)। পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারী একজন রাজনৈতিক ছাত্র-কর্মীকে নিয়ে রচিত হয়েছে মুনীর চৌধুরীর *নষ্ট ছেলে* (১৯৫০)। ১৯৬২ সালের ছাত্র আন্দোলনের পটভূমিতে মুনীর চৌধুরী লিখেছেন *চিঠি* (১৯৬৬)। ১৯৪৭-পরবর্তী সময়ে প্রতিবাদী চেতনার নাট্যধারায় ভাষা-আন্দোলনের পটভূমিতে লিখিত মুনীর চৌধুরীর *কবর* নাটকটি বিষয়, আঙ্গিক ও মঞ্চপরিকল্পনায় ব্যতিক্রমী ও বিশিষ্ট।

ভাষা-আন্দোলনের সপক্ষে সক্রিয় ভূমিকা থাকার অভিযোগে ১৯৫২ থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত কারারুদ্ধ ছিলেন মুনীর চৌধুরী। ১৯৫৩ সালে কারাবন্দী অবস্থায় ২১শে ফেব্রুয়ারি উদযাপনের উদ্দেশ্যে কারাগারেই অভিনীত হওয়ার উপযোগী এই নাটকটি রচনা করেন নাট্যকার। নাটক রচনার পেছনে রণেশ দাশগুপ্তের অনুপ্রেরণা থাকলেও অন্তর্গত তাগিদও সক্রিয় ছিল নাট্যকারের মননে। ভাষা-আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত *কবর* নাটকে ক্ষমতাসীন সরকারের দমননীতির নগ্নরূপ ফুটে উঠেছে। অত্যাচারের পাশবিক দৃশ্য, রক্ষণশীল সুবিধাভোগী নেতার দৃষ্টিভঙ্গি, আন্দোলনকারীদের প্রতি নির্যাতকের নির্মম নিপীড়ন ইত্যাদি সমকালীন বাস্তব প্রেক্ষাপট নাটকে খানিকটা অ্যাবসার্ড আবহে উপস্থাপিত হয়েছে। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষার

অধিকার রক্ষার দাবিতে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক ঘটনার বাস্তব নাট্যরূপ মুনীর চৌধুরীর *কবর*। নেতা চরিত্রটি এখানে অত্যাচারী শাসকের প্রতিনিধি, হাফিজ চরিত্রটির সঙ্গে চাটুকার সরকারি কর্মকর্তার সাদৃশ্য বর্তমান। স্বার্থপরতা ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে মুর্দা ফকির চরিত্রটি এক তীব্র প্রতিবাদ। মাতৃভাষা রক্ষার দাবিতে সংগ্রামী ছাত্রসমাজের প্রতিনিধিত্ব করেছে মূর্তিগুলো। সমালোচকের মতে যুগপৎ গভীর জীবনচেতনা ও বেদনাবোধের পরিচয় পাওয়া যায় তাদের তীক্ষ্ণ ও বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপে। কেবল বিষয়, চরিত্র ও সংলাপ নয়, *কবর* নাটকের মঞ্চায়ন কৌশলও ছিল অভিনব ও আধুনিক। কারাগারের সীমিত সুবিধায় মঞ্চায়ন করার প্রয়োজনে উন্মুক্ত গোরস্তান, সীমিত দ্রব্য এবং স্বল্প আলোর প্রয়োগে মঞ্চাঙ্গিক গড়ে উঠেছে এই নাটকের (মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন, ২০০৫ : ১৬২)। সমালোচকের মতে :

> প্রতিবাদী নাটক হিসেবে বাংলাদেশের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রচনা ১৯৫২ সালের বাংলা ভাষা আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত মুনীর চৌধুরীর *কবর*। একটি বাস্তব ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও প্রতিরোধধর্মী জীবনদর্শনের গাঢ় অনুভূতিময় প্রকাশের জন্য এবং উপস্থাপনার আঙ্গিকগত অভিনবত্বের কারণে নাটকটি বিশেষকে অতিক্রম করে সার্বজনীনতা অর্জন করেছে, সকল রকম অন্যায়ের বিরুদ্ধে মৃত্যুহীন প্রতিরোধের মহৎ প্রতীকী তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়েছে। (কবীর চৌধুরী, ১৯৯৯ : ৭৯)

ভাষা-আন্দোলন আমাদের জাতীয় জীবনে অত্যন্ত গুরুত্ববহ ঘটনা। কেননা, বাঙালি জাতীয়তাবাদের জন্ম এবং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা সুসংহত ও জাগ্রত হয়েছিল এই আন্দোলনের মাধ্যমে। *কবর* নাটকটি এই চেতনা ও বোধের সুস্পষ্ট পরিচয় বহন করে।

সমকালীন আর্থ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের ওপর রচিত হয়েছে মুনীর চৌধুরীর *নষ্ট ছেলে* (১৯৫০)। বাবা এরতাজুল করিম মানবিকতা-বর্জিত, প্রগতিবিরোধী এবং স্বার্থলোভী। গরীবের রক্ত চুষে তিনি বিত্তের মালিক, বঞ্চিতের বেদনা তাকে পীড়িত করে না। অথচ তারই কন্যা রাশেদা প্রগতিশীল, সাম্যবাদী ধারণার একজন রাজনৈতিক কর্মী। সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে রাশেদা তার আপসহীন সংগ্রাম চালিয়ে যায়। পঞ্চাশের দশকে মুসলিম লীগ সরকারের কঠোর ধর্মীয় অনুশাসনের বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজ প্রতিবাদী হয়ে উঠেছিল। এই প্রগতিশীল প্রতিবাদী চেতনার ছেলেরা একশ্রেণির নীতিবাগিশের নিকট 'নষ্ট ছেলে' হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিল। মুনীর চৌধুরীর *নষ্ট ছেলে* সেই আক্ষেপের ফসল। তবে, নাটকের নাম *নষ্ট ছেলে* হলেও এর প্রধান চরিত্র রাশেদা এক সংগ্রামী, আপসহীন নারী চরিত্র। একজন রাশেদার রক্ষণশীল পরিবারের পর্দা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠার

কাহিনি *নষ্ট ছেলে*। সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণে ছোট ভাই আমিনকে উদ্বুদ্ধ করে রাশেদা :

[রাশেদা] আপা: আগামীকাল ঈদ, হাজার হাজার লাখ লাখ লোক কালও রোজা রাখবে কারণ তাদের ঘরে খাবার নেই। নামায পড়তে যেতে পারবে না, কারণ কাপড় নেই। ঘর থেকে বেরুতে পারবে না, ক্ষুধায়, লজ্জায়। তাদের জন্য লড়াই করবি তুই? (মুনীর চৌধুরী, ২০০১ : ১৭২)

সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মুনীর চৌধুরীর পঞ্চাশের দশকের পর্যবেক্ষণ একাত্তরেও প্রত্যক্ষগোচর হয় এবং আশির দশকের স্বাধীন বাংলাদেশেও এই পর্যবেক্ষণ অনুপস্থিত নয় বলা যায় (সুকুমার বিশ্বাস, ১৯৯৮ : ২৩৭)। *নষ্ট ছেলে* সমকালীন সময় ও চরিত্র অবলম্বনে সমাজসচেতন একটি সফল নাট্যপ্রয়াস।

১৯৬২ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা ঘটনার প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছে মুনীর চৌধুরীর কৌতুকাবরণে প্রতিবাদী উত্তাপের নাটক *চিঠি* (১৯৬৬)। পরীক্ষার তারিখ পিছিয়ে দেওয়ার দাবিতে এক ধরনের ছাত্র-আন্দোলনের ঘটনার ওপর রচিত এই নাটকটি। নাটকের পাত্র-পাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, কর্মচারী প্রমুখ। বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সমস্ত অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি সামলাতে প্রশাসনের হাস্যকর উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়, এই নাটকে কৌতুকাবরণে তা ফুটে উঠেছে। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক বিরোধ ও ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব ও প্রেম, শিক্ষককে ব্যঙ্গ করা ইত্যাদি বিষয়ও উঠে এসেছে নাটকে। তবে ছাত্র-আন্দোলন সম্পর্কে ব্যঙ্গ নাট্যকারের অভিপ্রায় ছিল না। সমালোচক মন্তব্য করেছেন, 'যে রুদ্ধ পরিবেশে রাজনৈতিক আন্দোলন নিষিদ্ধ অথবা নিয়ন্ত্রিত, সেখানে নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষাদানে অস্বীকৃতির অভিপ্রায়ই রাজনৈতিক আন্দোলনের চারিত্র্য পাবে– তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। অতএব সংলাপে লেগেছে সংগ্রামী আদর্শের উত্তাপ' (আবু হেনা মোস্তফা কামাল, ১৯৯৯ : ৫৬)। কাহিনির বিন্যাস ও চরিত্র চিত্রণে নাটকটিতে নৈপুণ্য লক্ষণীয়। সামাজিক জীবনসত্য প্রকাশে মুনীর চৌধুরী এ নাটকে দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন।

আসকার ইবনে শাইখের (১৯২৫-২০০৯) *দুর্যোগ* (১৯৫৩) ও *দুরন্ত ঢেউ* (১৯৫৩) নাটক দুটি বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত। উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করার পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করে। *দুর্যোগ* নাটকটিতে ভাষা-আন্দোলনের প্রস্তুতি ও আমজাদ নামের এক দেশপ্রেমিক, আদর্শবাদী নিঃস্বার্থ যুবকের শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ তুলে ধরা হয়েছে। বায়ান্নর বাংলা ভাষার অধিকার রক্ষার আন্দোলন প্রভাব বিস্তার করেছিল এদেশের আপামর জনসাধারণের ওপর। আমজাদের একটি সংলাপ এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায় :

কাজের কি অন্ত আছে রিজি? নেই। আরে বাপদাদা চৌদ্দপুরুষ যে ভাষায় কথা বলে এসেছে, আজ সে ভাষায় কথা বলার অধিকারও আমাদের থাকবে না? মাথা খারাপ হয়েছে ওদের– দেশের লোকও আর ঘুমিয়ে নেই। সমস্ত দেশের বুক থেকে আজ আওয়াজ উঠেছে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে। (আসকার ইবনে শাইখ, ১৯৫৩ : ৮)

আমজাদ নিজেও সামিল হয়েছিল এই আন্দোলনে। আন্দোলনের ডাকে ভালোবাসার মানুষ রিজিয়াকে একা রেখে, দেশের স্বার্থে, ভাষার স্বার্থে এক দুর্যোগময় রাতে মহৎ উদ্দেশ্যে ঘর ছেড়েছিল আমজাদ। কাহিনিতে আদর্শ প্রচারের বাহুল্য থাকলেও চরিত্র ও সংলাপ সৃষ্টিতে নাট্যকারের শিল্পকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রায় একই রকম কাহিনির পুনরাবৃত্তি দেখতে পাই নাট্যকারের *দুরন্ত ঢেউ* (১৯৫৩) নাটকে। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে ভাষারক্ষার আন্দোলনে জয়ী হয়ে এদেশের মানুষ আরও বড় স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি হতে থাকে এবং পুঞ্জীভূত বিক্ষোভে সংগ্রামী জনতা ফেটে পড়তে শুরু করে। এই পটভূমির পাশাপাশি সমকালীন আর্থ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটও তুলে ধরেছেন নাট্যকার আলোচ্য নাটকে। দুরন্ত ঢেউ যেমন ভাবে ক্রমাগত আছড়ে পড়ে শক্ত উঁচু পাড় ভেঙে ফেলে, জনতার সম্মিলিত স্বর ও দেশপ্রেম সেভাবে শোষকের অন্যায় ও অবিচারের পাষাণ প্রাচীর একসময় ভেঙে ফেলতে সক্ষম হয়– নাটকের নায়ক আলমের সংলাপে তেমনই আশাবাদ ব্যক্ত হয়েছে।

১৯৪৭-পরবর্তী প্রতিবাদী নাটকের ধারায় আসকার ইবনে শাইখের *অগ্নিগিরি* (১৯৫৮) একটি অমূল্য সংযোজন। ব্রিটিশ রাজত্বকালে কোম্পানির প্রতিনিধি দেবী সিংহের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ফকির মজনু শাহ্-র নেতৃত্বে যে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল তার গৌরবময় রূপ ফুটে উঠেছে আলোচ্য নাটকে। খাজনা আদায়ের নামে দেবী সিংহ কৃষককুলের ওপর যে অত্যাচার নিপীড়ন চালাতো তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় জনদরদী ফকির মজনু শাহ্। দেবী চৌধুরাণী, ভবানী পাঠক ও রাণী ভবানীর নিকট হতে নৈতিক সমর্থনও পেয়েছিল জননেতা মজনু শাহ্। ইংরেজদের শোষণের বিরুদ্ধে এঁদের সম্মিলিত প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের আবেগ ও গৌরব-গাথা নাট্যরূপ পেয়েছে *অগ্নিগিরি* নাটকে (সুকুমার বিশ্বাস, ১৯৯৮ : ২১৫)। কাহিনির প্রাঞ্জলতা, দেশপ্রেমপূর্ণ সংলাপ, চরিত্রের বলিষ্ঠতা *অগ্নিগিরি* নাটকটিকে সফলতা এনে দিয়েছে।

আসকার ইবনে শাইখের রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা সমৃদ্ধ প্রতিবাদী কণ্ঠের আরেকটি নাটক *অনেক তারার হাতছানি* (১৯৬৫)। নাটকটিতে নাট্যকার ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ ও ১৯৬২ সালের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে এক সূত্রে গাঁথার প্রয়াস পেয়েছেন। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ ছিল ব্রিটিশ বেনিয়াদের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিক নির্ভীক

সিপাহীদের সশস্ত্র সংগ্রাম। আবার ১৯৬২ সালে এদেশের সুবিধাবঞ্চিত কোটি কোটি মানুষ গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও অর্থনীতির মুক্তির লক্ষ্যে রুখে দাঁড়িয়েছিল শাসকের রক্তচক্ষুকে অগ্রাহ্য করে। এদেশের মুক্তিকামী মানুষ সবসময়ই অবিচার-বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। সমকালীন সমাজের সুস্পষ্ট বিবৃতি ছাড়াও নাট্যকার অতীতের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এদেশের তরুণ সমাজকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। কাহিনি ইতিহাসের অনুগামী, সংলাপ সহজ আবেগময় এবং পাগলাটে অধ্যাপকের সংলাপ ১৯৪৭-পরবর্তী বাংলাদেশের আন্দোলনের উত্তাপ স্মরণ করিয়ে দেয়।

১৯৪৭-পরবর্তী সময়ে স্বৈরাচারী রাজনীতির কারণে বাঙালির প্রতিরোধবাসনা অনেক নাটকে সরাসরি উপস্থাপিত হয়নি। ষাটের দশকের অবরুদ্ধ সময়ে স্বৈরশাসকের-স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে কোনো-কোনো নাট্যকার নাটক লিখেছেন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মাধ্যমে, রূপক-প্রতীকের আশ্রয়ে। সিকান্‌দার আবু জাফরের (১৯১৯-১৯৭৫) *শকুন্ত উপাখ্যান* (১৯৬১), *মাকড়সা* (১৯৫৯); আলাউদ্দিন আল আজাদের (১৯৩২-২০০৯) *মরক্কোর জাদুকর* (১৯৫৯); শওকত ওসমানের (১৯১৭-১৯৯৮) *ক্রীতদাসের হাসি* (১৯৬৮), *বাগদাদের কবি* (১৯৫২) ইত্যাদি এই ধারার নাটক।

সিকান্‌দার আবু জাফরের রূপক-প্রতীকী নাটক *শকুন্ত উপাখ্যানে* যুদ্ধ-বিরোধী মানসিকতা ও শান্তির মহিমা প্রচারিত হয়েছে। এই নাটকের চরিত্রগুলো বিভিন্ন প্রজাতির পাখি, রক্তমাংসের মানুষ নয়। যুদ্ধ কেবল ধ্বংস ডেকে আনে, নিরীহ মানুষের ভোগান্তি বাড়ায়। অন্যদিকে শান্তির সন্ধি মহত্ত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে, হৃদয়ের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। পক্ষীকুলের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিয়ে অতঃপর শান্তিসন্ধি স্বাক্ষর করিয়ে নাট্যকার এই চরম সত্যটি রূপকের সাহায্যে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। সমালোচকের মতে :

> *শকুন্ত উপাখ্যান*-এর নাট্যকাহিনি রূপক হলেও এর নামকরণে আছে প্রতীকধর্ম। একদিকে এর নামকরণ পক্ষীকুলের উপাখ্যান বলে *শকুন্ত উপাখ্যান*– এটা ভেবে নেওয়া যায়। অন্যদিকে ধূর্ত, হিংস্র, অন্যের শাবক ছোঁ-মেরে-নিয়ে-যাওয়া স্বভাবসম্পন্ন শকুন্ত পাখির প্রতীকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির যুদ্ধপ্রিয়তা, ধাতব অস্ত্রধারীর নির্বুদ্ধিতা এবং দিকচক্ষু-জানাধিকরূপ মন্ত্রণাদাতার খেলনা পুতুল রাজশক্তির অদূরদর্শিতা হয়তো নাট্যকার তুলে ধরতে চেয়েছেন। কিন্তু একসময় এই শকুনশক্তি পরাভব মানবে; যুদ্ধের পরিবর্তে মানুষে মানুষে গড়ে উঠবে মিলনসেতু – সেই সূত্রেই নাটকের নাম হয়তো *শকুন্ত উপাখ্যান*। (বিশ্বজিৎ ঘোষ, ১৩৯৪ : ৮১)

শোষণ ও অবিচারমুক্ত সুস্থ সুন্দর সামাজিক জীবনে যুগে-যুগে সম্প্রীতির বন্ধনে মানুষ থাকবে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে, এমন আশাবাদই ব্যক্ত হয়েছে নাটকটিতে।

মাকড়সা (১৯৬০) সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রচিত নাট্যকারের অপর একটি রূপক নাটক। অনেক অত্যাচার অবিচারের শিকার হয়ে এদেশের মানুষ ব্রিটিশদের উৎখাত করেছিল। স্বপ্ন দেখেছিল স্বাধীন দেশে সামাজিক-অর্থনৈতিক মুক্তির। কিন্তু স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকারের শাসনামলে তাদের স্বপ্ন টুটে যায়। 'বুকের অন্ধকার নিভৃত চোরা কুঠুরীতে লুকিয়ে রেখে লালিত করা এই শাবকরূপ স্বপ্ন বারবার ভেঙে গেছে শাসকের আঘাতে। সেই ব্যর্থ স্বপ্নের বিদ্রোহের প্রতীক *মাকড়সা*' (মাহবুবা সিদ্দিকী, ১৯৯৩ : ২১৫)। এই একাঙ্কিকায় বর্ণিত সাক্ষীদের অভিযোগ একটিই– তাদের স্বপ্ন চুরি গেছে। নাট্যকার রূপকের আবরণে এই সত্য প্রকাশ করতে চেয়েছেন যে, সাধারণ লোকের স্বপ্ন চুরি করা সেই আসামি আর কেউ নয়, তৎকালীন সামরিক সরকার। স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে শ্লোগান তোলার আহ্বান পাওয়া যায় নাটকটিতে।

আলাউদ্দিন আল আজাদ রচনা করেছেন রূপক নাটক *মরক্কোর জাদুকর* (১৯৫৯)। 'আলাদীনের চেরাগ' আরব্যোপন্যাসের পটভূমিতে সমকালীন সমাজব্যবস্থার রেখাচিত্র পাওয়া যায় আলোচ্য নাটকে। প্রধান চরিত্র আলাদ্দিন ন্যায় ও সত্যের প্রতীক, অপর দিকে জাদুকর অন্যায় ও স্বার্থের প্রতীক। জাদুকররূপী সমাজের অশুভ শক্তির মানুষেরা সত্যসৈনিকদের আঘাত করে, দুর্বল করে দিতে চায়। এদের সম্পর্কে সচেতন থাকা এবং প্রয়োজনে সংগ্রাম করে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করাই সামাজিক দায়িত্ব। শান্তি-সৌহার্দ্য, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের বাহক আলাদ্দিনের প্রদীপ সমাজের অন্ধকার দূর করে সত্য প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হতে পারবে, নাটকের কাহিনি ও সংলাপে এই আকাঙ্ক্ষা সুস্পষ্টভাবে ধরা দিয়েছে।

শওকত ওসমানের বিখ্যাত উপন্যাস *ক্রীতদাসের হাসি* নাট্যরূপ দিয়েছেন রামেন্দু মজুমদার। রূপকাশ্রয়ী এই নাটকের মর্মবাণী হল অর্থ দিয়ে ক্রীতদাস কেনা সম্ভব হলেও ক্রীতদাসের হাসি কেনা সম্ভব নয়। রূপান্তরিত নাটকটিতে প্রতীকী তাৎপর্যে পশ্চিম পাকিস্তানরূপ বাদশাহ হারুনর রশীদের স্বৈরাচারী মনোভাব, দমননীতি ইত্যাদির বিরুদ্ধে ক্রীতদাসরূপ সাধারণ মানুষের প্রতিবাদের ছবি অঙ্কিত হয়েছে।

বাগদাদের কবি (১৯৫২) নাটকের প্রেক্ষাপট ঐতিহাসিক। রূপকের আড়ালে সমকালীন রাজনৈতিক নিপীড়ন এবং নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ফুটে উঠেছে এই নাটকে। নাট্যকার মনে করেন জনগণই সকল ক্ষমতার আধার, ক্ষমতা তাদেরই নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। নাটকটি বাদশাহ হারুনর রশীদের রাজত্বকালকে আশ্রয় করে লিখিত, তবে ইতিহাসের কাঠামোতে এখানে সমকালীন জনজীবনের স্পর্শ লেগেছে। অর্থাৎ সমকালকে ধারণ করছে, সমকালের চেতনা থেকে নাটকটি কোনোভাবে বিচ্ছিন্ন নয় কবি। ইসহাকের সংলাপে আমরা সমকালের সংকটকে স্পর্শ করতে পারি :

> এই খাজনা কোথা থেকে আসে? গরীবের খুন নিংড়ে আনা হয় নাকি? তাঁদের দীর্ঘশ্বাসে, হারুনর রশীদ তোমার বাগানের সাইপ্রাস যতটুক চঞ্চল হয়, তোমার মনে তার অল্প আঁচড়ও লাগে না। ... তোমার নেমকের দৌলতে, তোষামোদী করেছি আমার কাব্যের মারফত। ... আজকাল রাস্তাঘাটে গরীবের লাশ। একটা সচরাচর ঘটনা হামেশাই দেখা যাচ্ছে। কেউ জহর খেয়ে মরে, কেউ আত্মহত্যা করে। অধিকাংশ মরে ক্ষুধার তাড়নায়। (শওকত ওসমান, ১৯৫২ : ২৫-২৬)

ব্রিটিশ বেনিয়াদের অপশাসন শেষে জনগণ একটি ক্ষুধামুক্ত, শোষণ ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশ প্রত্যাশা করেছিল। কিন্তু, তাদের আত্মত্যাগ বরাবরই বিফলে গেছে। গরিব গরিবই রয়ে গেছে। শোষক ও স্বার্থবাদীরা ভাগ্যাহতদের শোষণ করেই যাবতীয় সুবিধা ভোগ করে – এই নির্মম সত্য উদ্ভাসিত হয়েছে আলোচ্য নাটকে। নাটকের কাহিনি ছন্দময়, সংলাপ বুদ্ধিদীপ্ত ও শাণিত। নাটকীয় দ্বন্দ্ব ও উৎকণ্ঠা উপস্থিত। *বাগদাদের কবি* শওকত ওসমানের একটি সফল নাট্যপ্রয়াস।

১.২ বাংলাদেশ পর্ব

১৯৭১-পরবর্তী স্বাধীন বাংলাদেশের সচেতন নাট্যকারেরা বিপর্যস্ত আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রতিবাদী ভূমিকা রাখেন। যাবতীয় শোষণ-বঞ্চণা-অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে তাঁরা অবস্থান নেন। নাট্যকারেরা তাঁদের প্রতিবাদী অভিমত প্রকাশও করেন নাটকের মাধ্যমে।

আবদুল্লাহ আল মামুনের (১৯৪৮-২০০৮) *সুবচন নির্বাসনে* (১৯৭৪) নাটকটিতে স্বাধীন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অবক্ষয়, হতাশা, অন্তর্গত ক্ষোভ ইত্যাদি বিষয় নাট্যরূপ পেয়েছে। আদর্শ স্কুল শিক্ষক পিতার বিরুদ্ধে জনতার প্রতীকী আদালতে মামলা করেছে তিন পুত্র-কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্র খোকনের মামলার অভিযোগ এই যে, পিতা তাকে শিখিয়েছেন, 'সততাই মহৎ গুণ' এই সুবচনটি। পিতার কথা অনুযায়ী সৎ থাকতে চেয়েছিল খোকন। কিন্তু সৎ থাকার মূল্য তাকে দিতে হয়েছে পদে পদে। এ সমাজ তার দায়িত্ব নেয়নি, তার কোথাও চাকুরি হয়নি। দ্বিতীয় পুত্র তপনের অভিযোগ– দরিদ্র স্কুল শিক্ষক তার বাবা তাকে শিখিয়েছেন 'লেখাপড়া করে যে গাড়ি ঘোড়ায় চড়ে সে' এই মিথ্যা বাক্যটি। সুবচনটি এই অবক্ষয়িত সমাজে, দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজে মিথ্যা বাক্যে পরিণত হয়েছে। লেখাপড়া শিখে গাড়ি-বাড়ির মালিক হয়নি তপন, হয়েছে অস্ত্রের মাধ্যমে। তপনের প্রতিবাদী উচ্চারণ :

> গাড়ি চড়ার কথা আমাকে কে শিখিয়েছিল বাবা? আমিতো বর্ণমালা শিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু শেখাতে গিয়ে আমাকে লোভ কেন দেখানো হল? একটু বড় হয়ে দেখলাম লোভটা আসলে ফাঁকি। আমার শিক্ষিত বড়ভাইয়ের স্যান্ডেলটা ক্রমশ ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। ...আমি বুঝতে পারলাম হাত ধরে আমার স্কুল মাস্টার বাবা আসলে মিথ্যা কথা শেখাচ্ছেন, আমাকে ফাঁকি দিচ্ছেন। (আবদুল্লাহ আল মামুন, ২০০১ : ৩৫)

মেয়ে রানুর অভিযোগ সে বাবার কাছে শিখেছে 'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে'। কিন্তু তার ব্যক্তিগত এই বিশ্বাস কোনো কাজে আসেনি। রানু সুখী হতে পারেনি। রানুর অভিযোগ তার বাবা যদি অত গুণের পাশাপাশি তাকে কিছু দোষও শিক্ষা দিতেন তাহলে হয়তো দুশ্চরিত্র, কাপুরুষ কেরানি স্বামীর সংসারে সে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারত। কেননা তার বাবা যে বিষয়গুলোকে দোষ হিসেবে চিহ্নিত করে চরিত্র থেকে নির্বাসিত করেছিলেন, রানুর স্বামীর সংসারে সেই দোষগুলোই অত্যাবশ্যকীয় গুণ হিসেবে বিবেচিত।

নাট্যকার বলতে চেয়েছেন, সুবিধাবাদী, স্বার্থপর, নীতিহীন, কপট সমাজে-সংসারে সুবচন-সুভাষণ অকার্যকর হয়ে পড়েছে। এই পতন ও অবক্ষয় ঠেকাতে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তোলা প্রয়োজন– নাটকটিতে এই ধরনের একটি আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে।

স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রতিবাদী নাটকের ধারায় আবদুল্লাহ আল মামুনের *এখনও ক্রীতদাস* (১৯৮৩) অত্যন্ত সফল একটি নাটক। স্বাধীন বাংলাদেশে পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা বাক্কা মিয়ার দুর্বিষহ জীবন এই নাটকের বিষয়বস্তু। যে স্বপ্ন নিয়ে তারা জীবন বাজি রেখে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, স্বাধীন দেশে তাদের সেই স্বপ্ন পূরণ হয় নি। বরং বাক্কা মিয়ারা শিকার হয়েছে অবিরাম শোষণ-বঞ্চনার। দুর্বৃত্তরা লুণ্ঠন করেছে তাদের ঘর-বাড়ি, জমি-জমা সব। আজ তারা ছিন্নমূল, ভাসমান, অনেকটা ক্রীতদাসের মতো জীবনযাপন।

নগরীর নিয়ন আলোর পাশাপাশি যে বস্তি গজিয়ে উঠেছে সে এক ভিন্ন অন্ধকার জগৎ। নাট্যকার মনে করেন, 'কেউ না কেউ কোনো না কোনোভাবে আমাদের জনগোষ্ঠীর বিরাট অংশটিকে এখনও সুকৌশলে ক্রীতদাস বানিয়ে রেখেছে' (রামেন্দু মজুমদার, ১৯৮৮ : ১৬)। বস্তির জীবন নিয়ে এমন বাস্তবঘনিষ্ঠ নাটকের সংখ্যা বিরল।

বাক্কা মিয়া পঙ্গু; কান্দুনি তার স্ত্রী, মর্জিনা মেয়ে। পঙ্গু বলে বাক্কা মিয়া উপার্জনে অক্ষম। স্ত্রী এবং সন্তানের উপার্জনে সে জীবিকা নির্বাহ করে। আত্মপ্রত্যয়ী মুক্তিযোদ্ধা বর্তমানে অসহায় বাক্কা মিয়া সবসময় নিজের মধ্যে গুটিয়ে থাকে, কেননা স্ত্রী ও কন্যার প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালনে সে অক্ষম। তার অসহায়তার সুযোগ নিয়ে কান্দুনিকে নিজের সম্পত্তি করে নিতে চায় হারেস আলী। মর্জিনার সতীত্ব নাশ করে কাজী। মর্জিনা কাজীর মুখোশ খুলে দিলে কাজীর লোকেরা মর্জিনাকে গুম করে ফেলে। মর্জিনার বন্ধু ফাইটার সাহায্য করতে চেয়ে পারে না, পুলিশের লোক তাকে মেরে ফেলে। কাজীর পিস্তল দিয়ে বাক্কা মিয়া কাজীকে মেরে ফেলতে চায়। কিন্তু পারে না। কাজীর চেলা বাক্কা মিয়াকে মেরে ফেলে। নাটকে বাক্কা মিয়া এবং বাক্কা মিয়ার মতো সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে নাট্যকার ক্রীতদাস বলতে চেয়েছেন। একজন ক্রীতদাস মনিবের ইচ্ছা-অনিচ্ছার অনুগামী। স্বাধীনভাবে বাঁচবার অধিকার এদের নেই।

সামাজিক মর্যাদা, অর্থনৈতিক মুক্তি কোনোটিই এদের নেই। তবে, এই শৃঙ্খল ভেঙে একদিন এরা বেরিয়ে আসবে এমন প্রতিবাদী সুর ধ্বনিত হয় বাক্কা মিয়ার কণ্ঠে :

> ...বারে বারে কি আমিই গুলি খামুরে? একবার ঠ্যাং এ, একবার সিনায়? একবার মারবো খানেরা, একবার মারবি তরা? এই খেইল কবে ফুরাইবো? কবে? ... তগ মতন পঁচা লেম্বুতে এই দ্যাশ ভইরা গ্যাছে। অহনে তগো লেম্বুচিপা দিয়া খতম করতে হইবো। লেম্বুচিপা একমাত্র পথ। (আবদুল্লাহ আল মামুন, ১৩৯৫ : ৭০)

'যে বা যারা কোনো না কোনো কৌশলে এদেশের জনগোষ্ঠীর বিরাট অংশকে ক্রীতদাস বানিয়ে রেখেছে, সেই শোষক শক্তির বিরুদ্ধে নাট্যকারের দৃঢ় প্রতিবাদ ব্যক্ত হয়েছে আলোচ্য নাটকে' (বিশ্বজিৎ ঘোষ, ১৯৯৯ : ২০৫)। যদিও বাক্কা মিয়ারা এই নষ্ট হয়ে যাওয়া, পঁচে যাওয়া সমাজের কতখানি শোধন করতে পারবে সেটি প্রশ্নবিদ্ধ, তবু নাট্যকার নাটকের শেষ দৃশ্যের শেষ অংশে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন :

> আসলে কাজী আবদুল মালেকেরা কখনও মরে না। মরে বাক্কা মিয়ারা। তবু এই বাক্কা মিয়ারাই ভবিষ্যতের হাতে একটা স্বপ্ন রেখে যায়। স্বপ্ন প্রতিরোধের, প্রতিশোধের এবং চূড়ান্ত প্রতিবিধানের। (আবদুল্লাহ আল মামুন, ১৩৯৫ : ৭১)

নাটকের সংলাপ ব্যঙ্গাত্মক, তীক্ষ্ণ এবং বাস্তবনিষ্ঠ। চরিত্রগুলো দোষে-গুণে জীবন্ত। নাটকের কাহিনি আবেগমথিত। প্রতিবাদী ধারার এই নাট্যকারের অন্যান্য নাটকের মধ্যে রয়েছে *শপথ* (১৯৭৮), *অরক্ষিত মতিঝিল* (১৯৮০), *ক্রস রোডে ক্রস ফায়ার* (১৯৮১), *চারিদিকে যুদ্ধ* (১৯৮৩), *দ্যাশের মানুষ* (১৯৯১), *মেরাজ ফকিরের মা* (১৯৯৫) ইত্যাদি।

শোষণমূলক সমাজব্যবস্থার মূলে আঘাত হেনে একে আমূল বদলে দেয়ার অভিপ্রায়ে মামুনুর রশীদ লিখেছেন একাধিক প্রতিবাদী নাটক। তাঁর *ওরা কদম আলী* (১৯৭৬), *ওরা আছে বলেই* (১৯৮০), *ইবলিশ* (১৯৮১), *গিনিপিগ* (১৯৮৩), *এখানে নোঙর* (১৯৮৪) ইত্যাদি এই ধারার নাটক।

চার বছরের ব্যবধানে রচিত *ওরা কদম আলী* ও *ওরা আছে বলেই* নাটক দুটি বিষয়বস্তু ও রচনাশৈলীতে প্রায় অভিন্ন। *ওরা কদম আলী* নাটকের বোবা কদম আলী একটি লঞ্চঘাটের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। কর্মব্যস্ত এই লঞ্চঘাটে অন্যান্য চরিত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে চায়ের দোকানদার আলীমুদ্দি, বই বিক্রেতা আনিস, সারেং, দারোগা, মলমবিক্রেতা, পানিওয়ালি রাবেয়া, কুলি সর্দার– এরা সবাই ছিন্নমূল, ভাসমান। এদের মত শিশু তাজুও ভাসতে ভাসতে একসময় এই ঘাটে এসে পড়ে। শোষক নায়েব আলী ব্যাপারী রাবেয়া ও তাজুকে নিজের একান্ত সম্পত্তি হিসেবে অধিকার করতে চায়। কিন্তু বোবা কদম আলী রুখে দাঁড়ায়। রাবেয়া ও তাজুকে সে আশ্রয় দেয়, সকল ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে

প্রতিবাদ গড়ে তোলে। এই ঘাটে নায়েবের একচ্ছত্র আধিপত্য মেনে নেয় না ছিন্নমূল মানুষগুলো– কদম আলীর নেতৃত্বে তারা প্রতিবাদ জানায়, প্রতিরোধে এগিয়ে আসে। এমনকি নায়েবের একান্ত অনুচর সর্দারও শেষপর্যন্ত নায়েবকে শায়েস্তা করার জন্য এদের সঙ্গে যোগ দেয়। প্রতিজ্ঞা করে ভবিষ্যতেও যেকোনো রকম অন্যায় হামলা হলে সম্মিলিত শক্তিতে তার মোকাবেলা করবে :

সর্দার : আইজ আমরা জিতছি– আমরা মানুষ অইছি। ... আজই থিকা এ ঘাটে আমরা মাথার ঘাম পায়ে ফেইলা কাম করুম আর আমাগো ইজ্জতের উপর হামলা আইলে জান দিয়া রুখুম। (মামুনুর রশীদ, ২০০৫ : ৬২-৬৪)

লঞ্চঘাটের সমস্ত অপকর্মের হোতা নায়েব আলী। সে ঘাটের ডাক নিয়ে চুক্তির চেয়ে বেশি পয়সা আদায় করে, এতিম শিশুদের নিম্নতম বেতনে হোটেলে কাজে লাগায়, মিথ্যা অভিযোগ তুলে লঞ্চের সারেংকে বেতন না দিয়ে নির্যাতন করে তাড়িয়ে দেয়, পানিওয়ালি রাবেয়াকে মাসের পর মাস কুমতলবে উত্যক্ত করতে থাকে ইত্যাদি। নায়েব আলীর সব অপকর্মের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করে কদম আলী। ধীরে ধীরে শোষিত মানুষগুলো একে একে কদম আলীর পক্ষে সমবেত হয়। নায়েব আলীর সমস্ত রোষ গিয়ে পড়ে কদম আলীর ওপর। তাই কদম আলীর আশ্রিত রাবেয়া যখন ইজ্জত বাঁচানোর প্রয়োজনে দা দিয়ে নায়েব আলীকে জখম করে, তখন রক্তাক্ত নায়েব আলী থানায় গিয়ে কদম আলীর নামেই অভিযোগ দাখিল করে। শোষিত-বঞ্চিত মানুষগুলো ততক্ষণে বাঁচবার প্রয়োজনে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। পুলিশ ইন্সপেক্টর এসে কদম আলীর খোঁজ করলে তাদের সংলাপে উঠে আসে এই প্রতিবাদী সত্তা :

সর্দার : আমি কদম আলী।

আলীমুদ্দি : আমি কদম আলী।

সারেং : আঁই কদম আলী।

রাবেয়া : আমি কদম আলী।

ইন্সপেক্টর : ননসেন্স, হু ইজ কদম আলী?

সবাই : আমরা কদম আলী।

ইন্সপেক্টর : ইডিয়েট। কদম আলী কে?

সবাই : আমরা।

পুলিশ : এই শূয়ারের বাচ্চারা, ইয়ার্কি পাইছ? কদম আলী তো বোবা। আবার মাইয়া মাইনষেও কয় আমি কদম আলী। ক, শূয়ারের বাচ্চারা, কদম আলী কে? (পুলিশ হাতের লাঠি দিয়ে বাড়ি দেয়, সবাই একসাথে প্রতিরোধ করে) । (মামুনুর রশীদ, ২০০৫ : ৬৪)

শোষিত মানুষের প্রতিরোধ ও প্রতিবাদের বলিষ্ঠ রূপায়ণ *ওরা কদম আলী*। কাহিনিতে সীমাবদ্ধ শৈথিল্য থাকলেও নাটকটি শ্রেণি-সংগ্রামের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ওরা আছে বলেই নাটকটিও শোষিত-নির্যাতিত মানুষের সম্মিলিত প্রতিরোধ ও প্রতিবাদী চেতনায় ঋদ্ধ। নাটকটি সম্পর্কে নাট্যকার মামুনুর রশীদ বলেন :

> ব্রিটিশ চলে গেছে বহু দিন। কিন্তু তার তৈরি লাল দালানের অভ্যন্তরে বাসা বেঁধেছিল যে আমলাতন্ত্র তা এখনো রয়ে গেছে তেমনি। মুৎসুদ্দি পুঁজির বিকাশের সাথে সাথে সে আরো শক্তিশালী হয়েছে। রাজনৈতিক পালাবদলে রাজা যায় রাজা আসে কিন্তু আমলাতন্ত্রের গায়ে আঁচর লাগে না মোটেই। পরাশক্তির হাতের পুতুল এই আমলারা ব্যাপক জনগণের শত্রু কিন্তু চিহ্নিত হয় নি কোনো কালেই। *ওরা আছে বলেই* নাটকে ছিন্নমূল ও ব্যাপক সংগ্রামী মানুষদের সাথে আমলাতন্ত্রের দ্বন্দ্বকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। (মামুনুর রশীদ, ১৯৯৬ : [পৃ. উল্লেখ নেই])

একটি রেলস্টেশনে দেশের নানা জায়গা থেকে অসহায়, শেকড়হীন, অবহেলিত, উপেক্ষিত, অত্যাচারিত বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন অবস্থার শ্রমজীবী মানুষের বাস্তব জীবনচিত্র এই নাটকটি। স্টেশন মাস্টার, সেনিটারি ইন্সপেক্টর, পয়েন্টসম্যান-এর শোষণ ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় সালাম মিস্ত্রী, কুলিমস্তান কালা, কাওছার, আসিয়া, আজি আরও অনেকে। অধিকার-সচেতনতা ও সংঘবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়াবার প্রেরণায় এই নাটকের গ্রহণযোগ্যতা অনস্বীকার্য। পুলিশ কর্মকর্তা গুলি করে বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করার হুমকি দিলে স্টেশনের সেনিটারি ইন্সপেক্টরও পুলিশের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে ওদের নিঃশেষ করতে বলে। কিন্তু সর্বহারা, শেকড়চ্যুত শ্রমজীবী মানুষগুলো তখন বাঁচার জন্য একজোট হয়েছে, অধিকার আদায়ের প্রশ্নে মৃত্যুকেও পরোয়া করে না তারা :

> কুলি : কয় জনরে শেষ করবা তোমরা–
>
> আসিয়া : আমরা হাজারে হাজার!
>
> কালা : আমরা লাখ লাখ!
>
> সবাই : আমরা কোটি কোটি! (মামুনুর রশীদ, ১৯৯৬ : ৬৪)

নাটকটি নিঃসন্দেহে শ্রেণিসংগ্রামের একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। তবে, নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার ঘোষণা দিয়েছেন যে, তিনি সংগ্রামী মানুষদের সঙ্গে আমলাতন্ত্রের দ্বন্দ্ব নাটকটিতে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। কিন্তু, নাটকের মূল শোষক চরিত্র স্টেশন মাস্টার, সে একসময় কলকাতার হাওড়া স্টেশনে কুলির কাজ করেছে, ইঞ্জিনে কয়লাও ঠেলেছে, কেরানি হয়েছে, এরপর পদোন্নতির মাধ্যমে স্টেশন মাস্টার হয়েছে। সুতরাং সে শক্তিশালী আমলাতন্ত্রের প্রতিভূ নয়। এখানে সেনিটারি ইন্সপেক্টর, পয়েন্টসম্যান, সেনিটারি কর্মচারী হাসেম আমলাতন্ত্রের প্রতিনিধিত্ব করেছে। প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত

বিচ্ছিন্ন বোধ একত্রিত হয়ে কী করে বিশাল প্রতিরোধ গড়ে তোলে তারই একটি রক্তাক্ত ইতিহাস *ওরা আছে বলেই* নাটক।

শোষিত-নিপীড়িত মানুষের বিদ্রোহ ও বিক্ষোভের আরেকটি স্পষ্ট চিত্রায়ণ দেখি মামুনুর রশীদের *ইবলিশ* নাটকে। গ্রাম্য মাতবর ফজল সিকদার, একাব্বর মেম্বর ও মুন্সি গ্রামের সাধারণ মানুষের নানান কৌশলে শোষণ করে আসছে বছরের পর বছর। গ্রামের অশিক্ষিত, অসচেতন মানুষদের অশিক্ষা, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ইত্যাদিকে অবলম্বন করে শোষকের শোষণ চলে অবিরাম। রফিক মজনুর নেতৃত্বে বঞ্চিত চাষীরা সংঘবদ্ধ হয় ও প্রতিবাদী হয়ে ওঠে।

গিনিপিগ নামের নাটকটিতে এদেশের রাজনীতিবিদ ও কর্মকর্তাদের অসততা, অস্পষ্টতা, ভণ্ডামি উঠে এসেছে। তৃতীয় বিশ্বের সামরিক জান্তা ও আমলাতন্ত্র শুধু ক্ষমতায় টিকে থাকার কারণে বিক্রি করছে জনগণকে – এই সত্য প্রকাশিত নাটকটিতে। জনগণ গিনিপিগের মতো ব্যবহৃত হচ্ছে এদের কাছে। গিনিপিগ অত্যন্ত নিরীহ একটি প্রাণী। তার ওপর নানান রকমের পরীক্ষা করা চলে, কারণ সে বিদ্রোহ করে না। 'তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর জনগণকে তেমন গিনিপিগ ভাবছে সাম্রাজ্যবাদ' (মামুনুর রশীদ, ১৯৯০ : [পৃ. উল্লেখ নেই])। ফলে নানান উপায়ে এদের শোষণ করে চলেছে তারা। মামুনুর রশীদ এই নাটকে দেখিয়েছেন, কখনো কখনো এই গিনিপিগরাও অধিকার-সচেতন হয়ে উঠতে পারে, বিদ্রোহ করতে পারে।

সমকালীন নাট্যকারদের মধ্যে মামুনুর রশীদের নাটকে শ্রেণিসংগ্রাম, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বহুলাংশে প্রতিফলিত। কিন্তু, তাঁর নাটকে কাহিনি প্রায়শই বৃত্তাবদ্ধ। তবুও তাঁর নাটকে ভাগ্য পরিবর্তনের লড়াই শোষণ-বঞ্চনার যাঁতাকলে পিষ্ট হতাশ মানুষের মনে এক ধরনের আশার সঞ্চার করে, সেই অনুভূতিটুকু অমূল্য।

মমতাজউদ্‌দীন আহমদের *স্পার্টাকাস বিষয়ক জটিলতা* (১৯৭৪) প্রতিবাদী ধারার একটি প্রতীকধর্মী নাটক। নিপীড়িত মানুষের মুক্তির জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন স্পার্টাকাস। তিনি নির্যাতিত মানুষের মুক্তি চেয়েছিলেন, সুখ চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন অধিকার, কিন্তু পেয়েছিলেন নিষ্ঠুর মৃত্যু। সম্রাট ক্রেসাস আর পম্পি ছয় হাজার সঙ্গীসহ হত্যা করেছিল স্পার্টাকাসকে। আলোচ্য নাটকে অত্যাচারী শাসক সূর্যকুণ্ডুর নিষ্ঠুরতা, অমানবিকতা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ভাস্বর হয়েছেন দরিদ্র লেখক। অসহায়, সংকটাপন্ন লেখককে অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে অনৈতিক, অনাদর্শিক কাজ করিয়ে নিতে চায় সূর্যকুণ্ডু। লেখক চেয়েছিলেন ক্রীতদাসের নেতা স্পার্টাকাসের জীবনী লিখবেন। কিন্তু প্রতাপশালী সূর্যকুণ্ডু তার জীবনী লিখতে বাধ্য করতে চায় লেখককে। অথচ লেখক সূর্যকুণ্ডু সম্পর্কে তেমন কিছুই জানেন না, সূর্যকুণ্ডুও জানেন না। কী লিখবে ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েন সূর্যকুণ্ডু। স্বপ্নে দেখেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্দুকযুদ্ধে নিহত

পিতার কন্যা ডালিয়াকে, আফ্রিকার আলো প্যাট্রিসকে, কৌতুক চরিত্র হরদম আলীকে, ভিয়েতনাম-প্যালেস্টাইন-ল্যাটিন আমেরিকার মুক্তিকামী জনগণের প্রতিনিধিদের– তারা সবাই লেখককে অনুরোধ করে, কেবল টাকার লোভে পড়ে লেখক যেন সূর্যকুণ্ডুর মিথ্যা, বানোয়াট জীবনী রচনা করে আত্মধিকৃত না হয়। লেখকের আদর্শ হচ্ছে ন্যায়, সত্য প্রকাশ করা, নিপীড়িত-নির্যাতিত মানুষের পাশে দাঁড়ানো, তাদের জন্য মুক্তির বাণী রচনা করা। লুমুম্বাকে কে হত্যা করেছে জানতে চাইলে লুমুম্বা লেখককে বলে :

লুমুম্বা ভণ্ডামি করো না কাপুরুষ। পৃথিবীর সবাই জানে আফ্রিকার আলো প্যাট্রিসকে কারা খুন করেছে। আর তুমি লেখক, সত্য প্রকাশের দেবতা, তুমি সে কথা সাহস করে বলতে পারছো না। লিখতে পারছো না। ...

লেখক আমি সূর্যকুণ্ডুর জীবনী রচনা করছি। সে মন্দ নয়।

লুমুম্বা ...মন্দ আফ্রিকার কালো অন্ধকার প্যাট্রিস লুমুম্বা? মন্দ প্যালেস্টাইনের নির্বাসিত গেরিলারা? মন্দ বাংলাদেশের প্লাবিত মানুষেরা? (মমতাজউদদীন আহমদ, ১৯৯৯ : ৩৫৯)

শেষপর্যন্ত লেখকের অন্তরের সুপ্ত বিদ্রোহী সত্তা জেগে ওঠে। ডালিয়া, স্পার্টাকাস, লুমুম্বা, শিউলি, সংগ্রামী বীর জনতা– সবার আহ্বানে সাড়া দেয় লেখক। সূর্যকুণ্ডুর বাতি নিভিয়ে দিয়ে, সূর্যকুণ্ডুর পাণ্ডুলিপি ছিঁড়ে ফেলে তার বলয় থেকে বেরিয়ে আসতে চায় লেখক, বিদ্রোহ ঘোষণা করে। যদিও শেষপর্যন্ত সূর্যকুণ্ডু বাঁচতে দেয় না লেখককে। মৃত্যুর পূর্বে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারার আত্মতৃপ্তি পেয়েছিলো লেখক। যুগে যুগে শোষিত, নিগৃহীত মানুষের পক্ষে তীব্র প্রতিবাদী *স্পার্টাকাস বিষয়ক জটিলতা*।

আশির দশকের একটি তীব্র প্রতিবাদী নাটক মমতাজউদ্‌দীন আহমদের *সাত ঘাটের কানাকড়ি* (১৯৮৯)। 'জ্ঞানের সঙ্গে বুদ্ধির, সাহসের সঙ্গে শক্তির, অঙ্গীকারের সঙ্গে উদ্যোগ ও আয়োজনের এমন সমাবেশ, সমাজ, রাজনীতি এবং দুষ্ট, দুর্জন ও দুষ্কৃতির এমন বাস্তব, সামগ্রিক, সামষ্টিক ও সাময়িক চালচিত্র একাধারে ও যুগপৎ' (আহমদ শরীফ, ২০০০ : ৭২০) শিল্পিত হয়েছে মমতাজউদ্‌দীন আহমদের *সাত ঘাটের কানাকড়ি* নাটকে। '৭১-এর স্বাধীনতাবিরোধীদের, বুদ্ধিজীবী হত্যার নীলনক্সাকারীদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার আওতায় আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংবিধানিক সুযোগ-সুবিধা করে দেওয়ার বিষয়টি নিদারুণ ক্ষোভে অভিব্যক্ত হয়েছে এই নাটকে।

কেরামত মঙ্গল নাটকের মাধ্যমে সেলিম আল দীন শোষিত মানুষের জীবন ও তাদের শোষণ-বঞ্চনার প্রকৃত চিত্র তুলে ধরেছেন। ১৯৪৭-এর দেশভাগ, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা, জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ, তেভাগা আন্দোলনকে ঘিরে হাজং বিদ্রোহ, ভাষা-আন্দোলন, ৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান, ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীন বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক

প্রেক্ষাপট ইত্যাদি বিষয় উঠে এসেছে এই নাটকে। সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থার পতন এবং পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার উত্থান, এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে সাধারণ মানুষের শোষিত হবার, বঞ্চিত হবার ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে *কেরামত মঙ্গলে*।

নাটকের নায়ক কেরামত শেকড়হীন, ভাসমান। এক স্থান থেকে আরেক স্থানে ভেসে-ভেসে বেড়ায়। একটু নিরীহ ও বোকা ধাঁচের কেরামত মানবিক বোধে উদ্দীপ্ত। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার সঙ্গে তার সদ্ভাব। কিন্তু মানুষের নির্দয়তা, হিংসা, ঘৃণা, ঈর্ষা কেরামতের জীবনে কষ্টদায়ক অভিজ্ঞতা এনে দেয়। ভেতরে ক্ষোভ সৃষ্টি হলেও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে সে প্রথম দিকে প্রতিবাদী হয়ে ওঠেনি। কিন্তু ক্রমাগত পীড়ন, অত্যাচার, হত্যা, আন্দোলন, মৃত্যু, পাশবিকতা কেরামতকে বিদ্রোহী করে তুলেছে, প্রতিবাদী করে তুলেছে।

কেরামত মঙ্গল-এর আখ্যান মোট বারোটি খণ্ডে বিভক্ত। বারো দোজখ খণ্ডের দীর্ঘ পথযাত্রায় কেরামতের যাবতীয় অভিজ্ঞতার ফসল *কেরামত মঙ্গল*। সমালোচকের মতে :

> প্রতিটি খণ্ডে নাট্যকার বাংলাদেশের মানুষের শ্রেণি-বৈষম্য, শোষণ-বঞ্চনা, দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ছবি আঁকতে চেয়েছেন। এদেশের গ্রামাঞ্চলের নিরক্ষর, অজ্ঞ, অক্ষম, নিঃস্ব ও নিরন্ন গণমানুষ যে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে অঞ্চল থেকে অঞ্চলে জমিদার, জোতদার, তালুকদার, শাসক-প্রশাসক, রাজনৈতিক নেতা সকলের দ্বারাই কোনো না কোনোভাবে নিপীড়িত-নির্যাতিত– তাই *কেরামতমঙ্গলে* উত্থাপিত। তবে এ নাটকের নায়ক প্রতিটি খণ্ডেই নির্যাতিত হলেও প্রতিবাদে পিছিয়ে আসে নি। মাথা নত করে নি কোথাও। (মো. জাকিরুল হক, ২০০৭ : ২৫০-২৫১)

কেরামতের নিরন্তর নির্যাতন, শোষণ ও অপমানের বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার ও রক্তাক্ত প্রতিবাদের আলেখ্য *কেরামত মঙ্গল* নাটকটি।

আগুনমুখা নাটকটিতে নাট্যকার মান্নান হীরা বিকল, অকার্যকর রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে গণবিপ্লবের চিত্র অঙ্কন করেছেন। শোষণহীন, বৈষম্যহীন সমাজ গঠনের লক্ষ্যে তিন জন বিপ্লবীর বিশ্বাস, আদর্শ, দ্বন্দ্ব, জীবনবোধ ইত্যাদি কেন্দ্র করে নাটকটি রচিত। নাটকটিতে প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে ভিন্ন আঙ্গিকে। সমাজ ও রাষ্ট্রযন্ত্রের ক্ষয় বা অকার্যকরিতার চিত্র তুলে ধরা নয়, কেবল সমালোচনা নয়– বরং সমাজ ও রাষ্ট্রকে ভালবেসেছে যেসব মানুষ তাদের কার্যক্রম ও কাহিনি নিয়ে রচিত হয়েছে *আগুনমুখা*। নাট্যকার মনে করেন, 'নারী-পুরুষের প্রেম যেমন, মানুষের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক সেও তেমনি জটিল। এগুলো কেবল যুক্তি আর দর্শকের সংজ্ঞায় ফেলে যেমন নির্ণয় করা যায় না, তেমনি কেবল আবেগের বশবর্তী হলে রাজনীতি ও মানবিক সম্পর্কের অনেক

সত্য অনাবিষ্কৃত থাকে' (মান্নান হীরা, ১৯৯৭ : ১)। এভাবে নাট্যকাররা বিশেষত সত্তর ও আশির দশকে তাঁদের বিবেক, দায়িত্ববোধ এবং অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সকল অনিয়ম, নিপীড়ন এবং শোষণের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে রচনা করেছেন প্রতিবাদী ধারার নাটক।

২. সমাজ-সমালোচনা ও সচেতনতামূলক নাটক

২.১ বিভাগোত্তর পর্ব

১৯৪৭-৭০ কালপর্বে সামন্তচেতনা-বিরোধী, প্রগতিশীল চিন্তার ধারক একদল নাট্যকার সাম্যবাদী সমাজ গঠনের লক্ষ্যে অগ্রসর ভাবনা ও মুক্তবুদ্ধির নাট্যচর্চায় এগিয়ে এলেন। কখনো তাঁরা সমাজের অভাব, অশিক্ষা, বৈষম্য, হীনমন্যতা, ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার ইত্যাদি বিষয়ে এদেশের মানুষকে সচেতন করতে সচেষ্ট হলেন, কখনো বা চোরাকারবারি, মজুতদারি, অবৈধ অর্থলিপ্সা, সামগ্রিক অর্থে মূল্যবোধের অবক্ষয় প্রসঙ্গে সমাজের সমালোচনা করলেন। তাঁদের মানবিক উচ্চারণ সমাজের মিথ্যা আভিজাত্যবোধ, অহংবোধ, শোষণ, নিপীড়ন, অত্যাচার, অবিচার প্রভৃতি বিষয়ে ব্যক্তি-মানুষকে সচেতন উপলব্ধি দিতে প্রয়াসী হয়েছে। সাম্যবাদী সমাজ গঠনের লক্ষ্যে হিন্দু-মসলিম সম্প্রীতির প্রয়োজন অনুভব করেছেন কোনো কোনো নাট্যকার।

দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে সৃষ্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের সাম্প্রদায়িক-সাম্রাজ্যবাদী-শোষক সরকার ধর্মকে রাষ্ট্র শাসনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার কৌশল হিসেবে সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে সক্রিয় রাখতে সচেষ্ট থাকে। সামন্তশক্তি হীন স্বার্থসিদ্ধির মানসে কখনো হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি চায়নি। ফলে তাদের কূট-কৌশলে বারবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে। সংখ্যালঘু জাতিসত্তা হিসেবে বারবার অসহায় বোধ করেছে হিন্দু সম্প্রদায়। অথচ এদেশের সাধারণ মানুষ অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের অধিকারী। হিন্দু-মুসলিম ভাই-ভাই হিসেবে সদ্ভাবে জীবন-যাপনে অভ্যস্ত। হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির স্বপ্নে আসকার ইবনে শাইখ ১৯৫২ সালে রচনা করলেন সামাজিক সচেতনতামূলক নাটক *বিদ্রোহী পদ্মা* (১৯৫২)। একই প্রেক্ষাপটে মোসলেম উদ্দিন রচনা করলেন নাটক *তিতুমীর* (১৯৫৪)। হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার পটভূমিতে মুনীর চৌধুরী লিখলেন নাটক *মানুষ* (১৯৪৭)।

১৯৪৭-পরবর্তী সময়ের নাটক আলোচনা প্রসঙ্গে যে নাটকটি সর্বাগ্রে গুরুত্ব পায় সেটি নুরুল মোমেনের (১৯০৬-১৯৯০) *নেমেসিস* (১৯৪৭)। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ বেনিয়াদের শোষণ-নিপীড়ন, বঞ্চনা ও নির্যাতনে ভারতবর্ষের সমাজজীবন হয়ে পড়েছিল পর্যুদস্ত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা, অমানবিকতা, অর্থনৈতিক বিপর্যয় ইত্যাদি কারণে জনজীবনে যে দুর্গতি দেখা দিয়েছিল, তার সুযোগ নিয়ে একদল মানবতাবিরোধী, কালোবাজারি, মজুতদারের হীন স্বার্থ সিদ্ধির ফলে ১৯৪৩ সালে সারা

বাংলায় নেমে এসেছিল দুর্ভিক্ষ। ১৯৪৩-এর সেই মানবসৃষ্ট দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে রচিত হয় নুরুল মোমেনের *নেমেসিস*।

পদ্মার তীরের মানুষের সংগ্রামমুখর জীবন বিধৃত হয়েছে আসকার ইবনে শাইখের *বিদ্রোহী পদ্মা* (১৯৫২) নাটকে। পদ্মার তীরের এই গ্রামটিতে রহমত, ঈশান, অর্জুন, আমুর মতো আরও অনেক হিন্দু-মুসলিম গরিব কৃষক মিলেমিশে সুখে-দুঃখে জীবন নির্বাহ করে। নিরীহ এই জনগোষ্ঠী জমিদারের অন্যায়-অবিচারের শিকার। তাদের শ্রমের, ঘামের পাকা ফসল জমিদার ও তার আজ্ঞাবহরা কেড়ে নিতে বদ্ধপরিকর। রফিক মাস্টার এই অন্যায় শোষণের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে চায়, প্রতিবাদে এগিয়ে আসার আহ্বান জানায়। কৌশল হিসেবে জমিদারের লোকেরা হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি ও সম্মিলিত প্রতিরোধকে ধূলিসাৎ করার অভিপ্রায়ে হিন্দু চাষী ঈশানের মেয়ে সুধাকে অপহরণ করে এবং জমিদারের চাটুকার হিন্দু নায়েব নিজেকে হিন্দুদরদী আখ্যা দিয়ে এই অপহরণের দায় চাপাতে চায় মুসলমান চাষী আমুর উপর :

> নায়েব : শোন ঈশান! এ কাজ আমু করেছে। আর সুধাও ইচ্ছা করে যায়নি, জোর করে নিয়েছে, কেস্ তোমাকেই করতে হবে। এ ব্যাপারের সঙ্গে সমস্ত হিন্দুর মান-সম্মান জড়িত। হিন্দুর মেয়ে সুধা, আমিও হিন্দু। আঘাত শুধু তোমারই মনেই লাগেনি, আমার মনেও লেগেছে। ... তুমি কি মনে কর, রফিক মাস্টারের এ কাজে হাত নেই? (আসকার ইবনে শাইখ, ১৯৯২ : ২৪৪)

মূলত জমিদার ও কায়েমি স্বার্থবাদীরা হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বাধিয়ে নিজেদের ফায়দা লুটতে চেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত রফিক মাস্টারের প্রচেষ্টায় তারা এই চক্রান্ত বুঝতে পারে এবং মাস্টারের নেতৃত্বেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে রুখে দাঁড়ায়। নাট্যকার সচেতনভাবেই হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির পথে মুখোশধারীদের চক্রান্ত তুলে ধরেছেন এবং এর রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। সাধারণ মানুষ রহমতকে তাই বলতে শুনি :

> অর্জুন শরীরটা কাইটা দেখ তোর শরীরেও যে রক্ত, আমার শরীরেও তাই। আমরা পর না অর্জুন, পর না। আমরা মানুষ, সবেই এক মানুষ, সবেই মানুষ। দুষমনের কথায় ভুলিস না ভাই। চর খালি আমার না সবেরই। হিন্দু-মুসলমানদের এই নতুন চর। (আসকার ইবনে শাইখ, ১৯৯২ : ২৪৮)

কাহিনি বিন্যাসে ও নাটকীয় উৎকণ্ঠা সৃষ্টিতে নাট্যকারের দক্ষতা প্রশংসনীয়। চরিত্র ও সংলাপ সৃষ্টিতে জীবনঘনিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রচলিত পদ্ধতিতে 'অঙ্ক' ও 'দৃশ্যে'র পরিবর্তে নাট্যকার 'ধারা' ও 'দৃশ্যান্তর' শব্দ দুটি ব্যবহার করেছেন। *বিদ্রোহী পদ্মা* নাটকটিতে তিনটি ধারা এবং প্রতিটি ধারায় দুটি করে মোট ছয়টি দৃশ্যান্তর রয়েছে। নাটকটি সমাজ সচেতনতামূলক নাটকের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ব্রিটিশ বাহিনী ও তাদের মদদপুষ্ট এদেশীয় দালালরা হিন্দু-মুসলিম বিভেদ সৃষ্টি ও বিরোধ বজায় রেখে তাদের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার চক্রান্তে লিপ্ত ছিল– মোসলেম

উদ্দীনের *তিতুমীর* (১৯৫৪) নাটকটিতেও এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষণীয়। নিপীড়ক ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হিন্দু-মুসলিম সকলকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এক হয়ে এগিয়ে যাবার আহ্বান জানায় তিতুমীর :

> ... আপনি হিন্দু আর আমি মুসলমান। কিন্তু এর চেয়েও বড় সত্য, আপনি বাঙালি আমিও বাঙালি, আমরা দুই ভাই, একই জন্মভূমির সন্তান হিন্দু-মুসলমান। আসুন আমরা উভয়ে শক্তি দিয়ে, সামর্থ্য দিয়ে, প্রয়োজনে জীবন দিয়েও এ অপমৃত্যুর করাল গ্রাস হতে বাংলাকে রক্ষা করি। বাংলার প্রতিটি নিঃস্ব কুটিরে স্বাধীনতার বিজয় পতাকা উত্তোলন করি। (সৈয়দা খালেদা জাহান, ২০০৩ : ৫৮)

১৯৪৬ সালের হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিতে মুনীর চৌধুরী লিখেছেন *মানুষ* (১৯৪৭)। এটি একটি একাঙ্কিকা। দাঙ্গা-আক্রান্ত অঞ্চলে বসবাসরত একটি রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছে *মানুষ*। পরিবারের বড় ছেলে মোর্শেদ বাড়িতে অনুপস্থিত, ছোট বোন জুলেখার জন্য বই কিনতে গিয়ে ফিরে আসেনি। মেজো ছেলে ফরিদ বড়ভাই মোর্শেদের অমঙ্গল আশংকায় হিন্দু-বিদ্বেষী হয়ে উঠেছে। শিশুসন্তান ছোট্ট খোকা ভীষণ অসুস্থ, থেকে থেকে তার দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে। জুলেখা ভয়ার্ত, বাবা উদ্বিগ্ন, মা শোকে স্থির এবং অসুস্থ সন্তানের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষায় একজন ডাক্তার প্রত্যাশা করছেন। বাইরে একবার আকাশ কাঁপানো বন্দে মাতরম ধ্বনি, পরক্ষণে অন্ধকার ছিন্নভিন্ন করা আল্লাহু আকবর হুংকারে পরিবারের সবাই আতংকিত, স্তম্ভিত। বাইরে দাঙ্গা শুরু হয়ে গেছে, ফেরেনি মোর্শেদ। হাসপাতালে বারবার ফোন করা সত্ত্বেও কোনো ডাক্তার এই দাঙ্গার মধ্যে রোগী দেখতে আসবেন না। এমন টানটান মুহূর্তে ঢোলা পাঞ্জাবি ও ধুতি পরা একজন আগন্তুক এই পরিবারে আশ্রয় প্রার্থনা করে। আশ্রয় মিলবে কি-না সে সিদ্ধান্ত হবার পূর্বেই ছোট্ট খোকাকে অসুস্থ দেখে নিজ দায়িত্বে তার শুশ্রূষায় লেগে পড়ে, পেশায় তিনি ডাক্তার। কিন্তু ধর্মে হিন্দু হয়ে মুসলিম এলাকায় ঢুকে পড়েছেন বলে এ পাড়ার মুসলমান ছেলেরা তাকে দল বেঁধে খুঁজে বেড়াচ্ছে, এ বাড়ির মেজো ছেলে ফরিদও আছে সেই দলে। ততক্ষণে আগন্তুক ডাক্তারের চিকিৎসায় ছোট্ট খোকা সুস্থ প্রায়। সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পর্দানশীন মা মশারির ভেতর নিজ শয্যায় আগন্তুককে আশ্রয় দিয়ে তার প্রাণ রক্ষা করেন। পাড়ার লোকেরা তল্লাশি শেষে ফিরে গেলে আগন্তুক লোকটি বেরিয়ে আসে। বিস্মিত ফরিদের জিজ্ঞাসা :

> ফরিদ : আম্মা! এ কে?
>
> লোকটা : আমায় বলছ ভাই? আমি মানুষ। (মুনীর চৌধুরী, ১৯৮২ : ১৫৯)

হিন্দু-মুসলিম কোনো আলাদা সৃষ্টি নয়, প্রত্যেকই মানুষ – পরস্পরের সেবা ও উপকারই মানুষের ব্রত – এই সচেতন মর্মবাণীর প্রকাশ ঘটেছে *মানুষ* একাঙ্কিকায়।

নাটকীয় সংঘাত ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টিতে নাটকের সংলাপগুলোর রয়েছে বলিষ্ঠ ভূমিকা। অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির ফসল *মানুষ* মুনীর চৌধুরীর একটি সফল সৃষ্টি।

হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের যথার্থ রূপ চিত্রিত হয়েছে আসকার ইবনে শাইখের *পদক্ষেপ* (১৯৫১) নাটকটিতে। একদিকে গোঁড়া মৌলবী অন্যদিকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বর্ণ হিন্দু, উভয়ের চিন্তা-চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এই নাটকে। 'সংলাপে সরলতা থাকলেও কাহিনি গতানুগতিক এবং অধিকাংশ চরিত্রই টাইপ' (সুকুমার বিশ্বাস, ১৯৯৮ : ৮৬)। তবে নাট্যকারের মূল উদ্দেশ্য যে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের সুস্থতা কামনা– সমাজমনস্ক এই নাটকে তা সুস্পষ্ট।

চোরাকারবারি, মজুতদারি সামাজিক এইসব সমস্যাকে চিহ্নিত করে জনমনে সচেতনতা সৃষ্টি ও প্রতিবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে এই কালপর্বে রচিত হয়েছে বেশ কিছু নাটক। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির লোভে বাজারে কৃত্রিম খাদ্য সংকট সৃষ্টি করে একশ্রেণির দুর্বৃত্ত কালো টাকার পাহাড় গড়ে তোলে। অপরদিকে গরিব হয়ে পড়ে আরও দুর্বল ও অসহায়। ওবায়েদ-উল হকের (১৯১১-২০০৮) *দিগ্বিজয়ী চোরাবাজার* (১৯৫০); আসকার ইবনে শাইখের *আওয়াজ* (১৯৫৩); ফররুখ শিয়রের *ব্ল্যাক মার্কেট* (১৯৫৩); আল মনসুরের *বোবা মানুষ* (১৯৫৬); সাঈদ আহমদের (১৯৩১-২০১০) *মাইলপোস্ট* (১৯৭৬) ইত্যাদি এই ধারার নাটক।

আওয়াজ একটি একাঙ্কিকা। আলিম চকদার নামক একজন চোরাকারবারি প্রচুর ধান গুদামজাত করে এবং বিদেশে পাচার করে বাজারে কৃত্রিম খাদ্যসংকট তৈরি করে। ক্ষুধার তাড়নায় দরিদ্র মানুষগুলো নিজেদের সামান্য বিষয়-সম্পত্তি চকদারের নিকট নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করে তার কাছ থেকে চড়ামূল্যে ধান কিনে নেয়। জনগণের দুর্দশাকে হাতিয়ার করে বিত্তের পাহাড় গড়ে চকদার। দিশেহারা জনতাকে পথ দেখায় রশীদ মিয়া। তাদেরকে অধিকার সচেতন করে তোলে সে। রশীদের প্রতিবাদের আহ্বানে বাউলও সাড়া দেয় :

> জাগবে সায়েব জাগবে। আপনার কথা শুইনা জাগবে সবাই। বুঝতে পারছি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো আমার আল্লা রসুলের আদেশ। এখন থাইকা আগুনের সুরে বাজবে আমার একতারা – আগুন ধরবে মানুষের মনে, শক্তি জাগবে ভাঙা বুকে, শুকনো হাতে। সায়েব, রাত যখন হইছে, ভোর হইতে কতক্ষণ? (আসকার ইবনে শাইখ, ১৯৯২ : ৩০)

সম্মিলিত শক্তি সবসময়ই দুর্নিবার। জনতার সম্মিলিত প্রতিবাদে চকদার ন্যায্য মূল্যে ধান দিতে বাধ্য হয় শেষ পর্যন্ত। প্রতিবাদী জনতা ন্যায্য পাওনা বুঝে নিতে তীব্র আওয়াজ তোলে :

জনতার সম্মিলিত কণ্ঠ : চকদার! ধানের গোলা খুলে দাও, দাম দিয়ে নেব, অন্যায় করব না, করতেও দেব না। সহ্য করেছি বহু অন্যায়, আর নয়। (আসকার ইবনে শাইখ, ১৯৯২ : ৩৩)

বঞ্চিত জনতার সম্মিলিত কণ্ঠের প্রতিবাদ *আওয়াজ* একাঙ্কিকাটি। কেবল চকদার নয়, যে কারও অপশাসন থেকে মুক্ত হবার বিপ্লবী আহ্বান *আওয়াজ*। 'রাত যখন হইছে, ভোর হইতে কতক্ষণ?'– এ সংলাপটিতে নাট্যকারের জীবনদর্শন ভাস্বর হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে বিশ্বযুদ্ধের ঢেউ লাগা বাংলার দুর্ভিক্ষ, কালোবাজারি, মজুতদারির বিস্তৃত পটভূমিতে ফররুখ শিয়রের *ব্ল্যাক মার্কেট* (১৯৫৩) একটি সচেতন শিল্পপ্রয়াস। দুর্ভিক্ষের বাজারে গ্রামের দরিদ্র অসহায় মানুষের পেটে যখন অন্ন নেই, ক্ষুধার যন্ত্রণায় কাতর– জমিদার আলী আহসান, প্রেসিডেন্ট কমরউদ্দিন, ব্যবসায়ী ভূতমলজী সেই অসহায় অবস্থার সুযোগ নেয়। খাজনার জন্য নিরীহ প্রজাদের চাপ প্রয়োগ করে, খাদ্য গুদামজাত করে তাদের অনাহারে রাখে। এমনকি তাদের গৃহের সামান্য তৈজসপত্র বন্ধক রেখে চড়া সুদের কারবার শুরু করে, দুর্ভাগা পিতা-স্বামীর অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে তাদের কন্যা, স্ত্রীদের নির্যাতন করে। জনগণ একসময় প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে। নাটকের চরিত্রগুলো বাস্তবানুগ। চরিত্র অনুযায়ী সংলাপগুলো যথাযথ ও প্রাঞ্জল। আঞ্চলিক ভাষার সফল ব্যবহার রয়েছে নাটকটিতে (সুকুমার বিশ্বাস, ১৯৯৮ : ১৩৬)।

১৯৪৩ সালের সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষের অভিজ্ঞতায় সাঈদ আহমদ লিখলেন *মাইলপোস্ট* (১৯৭৬) নাটকটি। এ সম্পর্কে নাট্যকার বলেন :

> মাইলপোস্ট লিখলাম ৬৪-তে। ক্ষোভে লিখলাম। যেখানে যাই ভূখা হ্যায় বাঙালি। ... রাস্তাঘাটে দেখলাম বহুৎ লাশ পড়ে ছিল। খেতে পায় নি। ফ্যান খেত, আর পেট মোটা হয়ে মরে যেত। ... মুসলমান হিন্দু কারো শাড়ি কাপড় নেই। সে প্রেক্ষাপটের আলোকে লিখলাম *মাইলপোস্ট*। (সাঈদ আহমদ, ২০০৮ : ১০৮)

নাট্যকারের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয় যে, নাটকটি নিদারুণ এক বাস্তবতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। 'দুর্ভিক্ষ যে শুধু নিরন্নের হাহাকার নয়, মানবাত্মার সংকটের এক তীব্র আর্তনাদও– এই সত্য প্রকাশের তাগিদে মাইলপোস্ট লেখা হয়' – বাংলা একাডেমি কর্তৃক ১৯৭৬ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত *মাইলপোস্ট* নাটকের শিরোনামহীন ভূমিকা অংশে নাট্যকার এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। একটি অঙ্ক ও তিনটি দৃশ্যে বিন্যস্ত এই নাটকটির কেন্দ্রীয় চরিত্র মাইলপোস্ট অর্থাৎ দিকনির্দেশকারী জড়বস্তুটি এই নাটকের প্রাণ। মাইলপোস্ট মূলত প্রতীকী প্রকাশ– এটি নিশ্চয়তার প্রতীক। দেশ, সমাজ, সভ্যতা জীবনকে নির্ঝঞ্ঝাট করতে এই সব নিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে, যা কেবল নিয়মেরই নামান্তর। এই নিয়মের বিরুদ্ধে, নিশ্চয়তার বিরুদ্ধে ব্যক্তিসত্তা কখনো কখনো বিদ্রোহী হয়ে ওঠে (আতাউর রহমান, ১৯৭৬ : ৫১)। আর তাই নাটকের শুরুতে

আমরা এই নিশ্চয়তার বিরুদ্ধে চৌকিদারকে বিদ্রোহ করতে দেখি, যখন মাইলপোস্টের দিকনির্দেশকারী ফলকগুলোকে সে ইচ্ছেমতো বদলে দেয়। এই বদলে দেয়ার মধ্য দিয়ে নাট্যকার প্রথার বিরুদ্ধে কিংবা নিয়ম ভাঙার প্রতি মানুষের চিরকালীন অভিপ্রায়কে তুলে ধরেছেন। এক অর্থে নিয়ম ভাঙতে অনুপ্রাণিত করেছেন। একটি মহল নিজেদের সুবিধা ও স্বার্থে আর একটি শ্রেণিকে অবদমন করে রাখবে শোষণ করে চলবে, কিছু নিয়ম-নীতির বুলি আওড়ে তাদেরকে নিষ্ক্রিয় করে রাখবে নাট্যকার এই বিষয়টিকে সমর্থন করেন না। অধিকার আদায়ের জন্য কখনো কখনো নিয়ম ভাঙতে হয়। কেননা, নিয়ম সমাজই সৃষ্টি করে সামাজিক নিশ্চয়তার জন্য। কিন্তু সে নিয়ম যদি পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিশ্চয়তা দিতে না পারে তাহলে সে নিয়মের পরিবর্তন, প্রতিকার প্রয়োজন। নাটকে দুর্ভিক্ষের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করতে হলে সন্তানকে উৎসর্গ করতে হবে বলে মা স্বপ্নে সংকেত পেয়েছেন। মানুষ উৎসর্গের ঘটনা এই প্রথমবারের মত ঘটতে যাচ্ছে না, অতীতেও ঘটেছে। কিন্তু সঙের সংলাপে সংকট ফুটে ওঠে এভাবে :

> লক্ষ বছর আগে ছেলে ছিল একটি। আপনার ছেলে দুটি। এর মধ্যে কে বেশি প্রিয়? কাকে আপনি উৎসর্গ করতে যাচ্ছেন? স্বপ্নের দরবেশ তো আপনাকে কোন নির্দিষ্ট নাম বলেন নি। (সাঈদ আহমদ, ১৯৭৬ : ৯৭)

অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ বছর ধরে যে নিয়ম, যে প্রথা তা সর্বদা সংকটের অবসান ঘটাতে পারে না। কখনো কখনো নিয়মের পরিবর্তন জরুরি হয়ে পড়ে। ক্রমাগত বন্যা, খরা, দুর্ভিক্ষ, মহামারিতে বাংলা মা তার উর্বরা শক্তি হারিয়ে ফেলছে, হয়ে পড়েছে দুর্বল, দরিদ্র, বিধ্বস্ত। নাট্যকার প্রত্যাশা করেন দেশমাতাকে বাঁচাতে এদেশের সন্তানরা সব জড়তা, সীমাবদ্ধতা, অনিশ্চয়তার বিরুদ্ধে লড়বে, ভাগ্যকে পরিবর্তন করবে, নতুন ভোরের আলোক রশ্মি চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে।

'অ্যাবসার্ড আঙ্গিকে রচিত *মাইলপোস্ট* নাটকের গঠনে শিথিলতা রয়েছে। ইঙ্গিতের, বক্তব্যের এবং সংলাপের ধাঁচের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে কোথাও কোথাও। এই নাটকের প্রধান ক্রটি, এতে কৌতূহল উদ্দীপক গতির অভাব রয়েছে' (হাসান হাফিজুর রহমান, ১৯৭৩ : ১৫-১৭)। এসব ক্রটির পরও *মাইলপোস্ট* সমাজমনস্ক নাট্যকারের অন্যতম শিল্পপ্রয়াস।

সমকালীন সমাজের কুসংস্কার, ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাস, নীতিহীনতা, হঠকারিতা ইত্যাদি সামাজিক সমস্যা সম্বলিত বিষয়কে উপজীব্য করে নাটকের ক্ষেত্রে যে সমাজ-সমালোচনামূলক ধারা গড়ে উঠেছিল তাতে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর (১৯২২-১৯৭১) *বহিপীর* (১৯৬০); ওবায়েদ-উল-হকের *এই পার্কে* (১৯৫৩); আবদুল হকের *অদ্বিতীয়া* (১৯৫৬); আশরাফ-উজ-জামানের *সয়লাব* (১৯৫৬); আযীম উদ্দীনের *অহঙ্কার* (১৯৬০); রাজিয়া খানের *আবর্ত* (১৯৬০) ইত্যাদি নাটকের রয়েছে বিশিষ্ট ভূমিকা।

ওবায়েদ-উল-হকের তিন অঙ্ক বিশিষ্ট *এই পার্কে* নাটকটি সামাজিক বৈষম্য, হতাশা, নীতিহীনতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয় অবলম্বনে লিখিত। একটি পার্কে তিনি সমাজের বিভিন্ন বয়সের, পেশার এবং বিত্তের মানুষের সাক্ষাৎ ঘটিয়েছেন। এদের মধ্যে ছাত্র, উকিল, পকেটমার, কবি, মক্কেল, পুলিশ অফিসার, কেরানি সকলেই আছেন। এই সব চরিত্রের জীবনালেখ্য *এক পার্কে* নাটকটি। হীনমন্যতার শিকার উকিল, অর্থনৈতিক সংকটে জর্জরিত কবি, জীবিকার সন্ধানে বেকার যুবক আলিম, বেঁচে থাকার মত অর্থ সংগ্রহের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ক্যানভাসার, পকেটমার, অসুস্থ স্ত্রীর চাকুরিহীন হতভাগ্য কেরানি স্বামী– প্রত্যেকেই যেন সমাজসত্যকে তুলে ধরেছে। সামাজিক যে সমস্যাগুলোকে তিনি চিহ্নিত করেছেন, নাটকে সেগুলোর কোনো সমাধান পাওয়া যায় না। নাট্যকার পেশায় সাংবাদিক ছিলেন বলে বিভিন্ন পেশার ও শ্রেণির মানুষকে একান্তে দেখবার, তাদের সম্পর্কে জানবার সুযোগ পেয়েছেন। সেই দিক থেকে নাটকের চরিত্রগুলো বাস্তবানুগ হওয়াই স্বাভাবিক। তবে নাট্যকাহিনির ধারাবাহিকতা সর্বত্র বজায় থাকেনি। আলম চরিত্রটির মধ্যে ট্র্যাজিক গুণ বিদ্যমান। ওবায়েদ-উল-হকের *এই পার্কে* সমাজ-সমালোচনামূলক সার্থক নাটক।

আধুনিক মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমানের সামাজিক সমস্যামূলক নাটক আবদুল হকের *অদ্বিতীয়া* (১৯৫৬)। মুসলমান সমাজে প্রচলিত বহুবিবাহ এবং তার ফলে সৃষ্ট সমস্যা বিষয়ে লিখিত হয়েছে *অদ্বিতীয়া*। নাটকের নায়ক আনোয়ার একজন ঔষধ ব্যবসায়ী। অসদুপায় অবলম্বন করে সে বৈভবের মালিক হয়েছে এবং নৈতিক স্খলনের সঙ্গে সঙ্গে তার চারিত্রিক অবক্ষয়ও দেখা দিয়েছে। স্ত্রী ও কন্যা নিয়ে তার সুখের সংসার ছিল, নিজ হাতে তা ধ্বংস করে সে। ব্যবসায় আরও উন্নতি করার লক্ষ্যে সুন্দরী আধুনিক তরুণী ফরিদাকে বিয়ে করে আনোয়ার। স্বামীকে ফেরাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন রাবেয়া। কন্যা লিলি নতুন মা ফরিদাকে মেনে নিতে পারে না। উদ্ভূত পরিস্থিতি সামাল দিতে আনোয়ার অপারগ। দ্বিতীয় স্ত্রী ফরিদা আনোয়ারকে ছেড়ে থাকার সিদ্ধান্ত নেয় :

> আমার প্রেমে পড়ে তুমি যদি লিলির মাকে তালাক দিতে, তবে আমি বুঝতাম তুমি প্রেমিক। এখন আর কারো প্রেমে পড়ে তুমি যদি আমাকে তালাক দিতে তাহলেও বুঝতাম তুমি প্রেমিক। ...তুমি নারী বিলাসী, আর যারা নারী বিলাসী তাদের আমি মনে প্রাণে ঘৃণা করি ... আমাদের প্রেম এখন ঠাণ্ডা লাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। (আবদুল হক, ১৯৫৬ : ১২২)

নানাবিধ নীতিহীনতার খণ্ড খণ্ড চিত্র *অদ্বিতীয়া* নাটকটি। পাঁচ অঙ্কের, ছয়টি দৃশ্যের নাটকটিতে সামাজিক বিভিন্ন সমস্যার নানা চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। শিল্প সফলতা না পেলেও তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরার ক্ষেত্রে *অদ্বিতীয়া* অদ্বিতীয়।

মিথ্যা আভিজাত্যবোধ মানুষকে কতটা ভ্রান্তির মধ্যে রাখতে পারে এবং প্রকৃত শিক্ষা কখনও এই ধরনের ঠুনকো বোধকে লালন করে না– এই উপলব্ধি নিয়ে আশরাফ-উজ-

জামান রচনা করেছেন নাটক *সয়লাব*। সৈয়দ সাহেব জমিদার; আভিজাত্যবোধ তার অহঙ্কার। জমিদারিতে দিনে দিনে ধস নামে। তার সন্তানেরা বিত্তের মোহে ব্যস্ত, শিক্ষার প্রয়োজন বোধ করে না। অন্যদিকে একই গ্রামের মীর সাহেব অবস্থাপন্ন গৃহস্থ, সন্তানদের সুশিক্ষার ব্যাপারে তার নজর সবার আগে। মীর সাহেব সৈয়দ পরিবারের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করতে চাইলে সৈয়দ সাহেবের আভিজাত্যবোধ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। বন্যায় গ্রামের সবকিছু যখন সয়লাব, এমনকি সৈয়দ সাহেবের ঘরেও পানি উঠেছে তখন মীর সাহেবই নৌকা করে সৈয়দ পরিবারকে তার বাড়িতে নিয়ে যান এবং দোতলার ঘরে থাকবার বন্দোবস্ত করে আতিথেয়তার চূড়ান্ত ব্যবস্থা করেন। সৈয়দ সাহেব যাদের পরম শত্রু বলে জ্ঞান করেছেন তাদের পরিবারের এরূপ আচার-ব্যবহার তাকে মুগ্ধ করে এবং তিনি বুঝতে পারেন যে, শিক্ষার আলোতেই তাদের আচার-আচরণ এত পরিশীলিত। মীর সাহেবের অনেক দিনের প্রত্যাশা পূরণ হয়, ছেলের সঙ্গে তিনি সৈয়দ সাহেবের মেয়ের বিয়ে দেন। কাহিনি নির্মাণে, বৃত্তগঠনে, চরিত্র সৃজনে, সংলাপের সার্থক প্রয়োগে জীবনচেতনবাহী *সয়লাব* একটি সার্থক সৃষ্টি (সুকুমার বিশ্বাস, ১৯৯৮ : ১৩৯)।

আযীম উদদীন আহমদের পঞ্চাঙ্ক সামাজিক নাটক *অহঙ্কার* (১৯৬০); *সয়লাব*-এর মতো প্রায় একই বিষয়কে অবলম্বন করে লিখিত। বংশমর্যাদা ও আভিজাত্যবোধ সমাজজীবনে যে সমস্যা ও জটিলতা তৈরি করে তারই বাস্তব চিত্রায়ণ *অহঙ্কার*। প্রাকরণিক নিরীক্ষায় নাটকটির দুর্বলতা থাকলেও সামাজিক সমস্যার চিত্রায়ণে *অহঙ্কার* সার্থক।

কৃত্রিম আভিজাত্যবোধ ও আধুনিকতার নামে অধঃপতনের এক প্রামাণ্য দলিল আ.ন.ম. বজলুর রশীদের (১৯১১-১৯৮৬) *ঝড়ের পাখি* (১৯৫৯)। সমকালীন সমাজে উচ্চশিক্ষিত নর-নারীদের নৈতিকতাহীন কার্যকলাপ, ভোগলিপ্সা সমাজ ও জীবনকে ক্রমাগত অসুখি করে তুলেছিল– 'নামিয়ে দিয়েছিল অধঃপতনের পঙ্কে। সহজ জীবনের সার্থক, সুন্দর ও কল্যাণের অভিসারী নাট্যকারদের পীড়িত করেছিল তথাকথিত আধুনিকতা। ... আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার উচ্ছৃঙ্খলতা, উৎকট বস্তুবাদ, কৃত্রিমতা ও বিলাস-পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত সমাজের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে *ঝড়ের পাখি* নাটকে' (সৈয়দা খালেদা জাহান, ২০০৩ : ৭৬-৭৭)। নাটকটিতে পাঁচটি দৃশ্য রয়েছে, কোনো অঙ্ক বিভাজন নেই। এ নাটকে সামাজিক সমস্যার চিত্র অঙ্কিত হলেও কাহিনি ও চরিত্র সৃষ্টি হতাশাব্যঞ্জক।

রাজিয়া খানের *আবর্ত* (১৯৬০) নাটকটিতেও আমরা প্রায় একইরকম উচ্ছৃঙ্খল, অমানবিক সমাজের দেখা পাই। দেশবিভাগের পর ঢাকাকে ঘিরে কুরুচিপূর্ণ এক কৃত্রিম নাগরিক সমাজ গড়ে উঠেছিল, যারা নিজেদের আধুনিক বলে দাবি করত। তাদের

চালচলন ছিল অশালীন, আচার-আচরণ রুচিহীন, কিন্তু বাহিরের চাকচিক্য ছিল ষোলআনা। 'চকচক করলেই সোনা হয় না'– এই আপ্তবাক্য ভুলে গিয়ে অনেকেই তাদের মোহে পড়তেন। যেমন পড়েছিলেন *আবর্ত* নাটকের মফস্বল শহরবাসী নাসিরুদ্দিন। বিদেশ-ফেরত সালামের বাইরের চাকচিক্য দেখে কেবল টাকার লোভে তিনি সালামের সঙ্গে মেয়ে পান্নার বিয়ে দিলেন। কিন্তু সালাম একদিকে ছিল মাতাল, অন্যদিকে চরিত্রহীন। স্ত্রীর ছোটবোনের সঙ্গে সে অশোভন ও অবৈধ আচরণে লিপ্ত। সুখী হয় না পান্না এবং একসময় সালামের সংসার ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

রাজিয়া খানের *আবর্ত* নাটকের সংলাপগুলো কাব্যময় ও বুদ্ধিদীপ্ত, নাটকীয় দ্বন্দ্ব নেই বললেই চলে। 'কাহিনি নির্মাণে বাস্তবতা অপ্রতুল'। আঙ্গিকগত কিছু ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও নাট্যকার সামাজিক অবক্ষয়ের স্বরূপটি তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে।

এই ধারার উল্লেখযোগ্য সংযোজন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র (১৯২২-১৯৭১) *বহিপীর* (১৯৬০) নাটকটি। সমাজ ও সময় সচেতন নাট্যকার সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর *বহিপীর* নাটকে সামাজিক কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও অন্ধবিশ্বাস, ধর্মের নামে ভণ্ডামি ও শোষণ ইত্যাদি বিষয়কে প্রাধান্য দিয়েছেন। সমাজব্যবস্থা ও মূল্যবোধের পরিবর্তনে যে দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন ঘটেছিল এই নাটকে আমরা তার পরিচয় পাই। বইয়ের ভাষায় কথা বলা বহিপীর তার মুরিদের ভক্তির সুযোগ নিয়ে বিয়ে করে অল্পবয়সী মুরিদকন্যা তাহেরাকে। তাহেরা আত্মবিশ্বাসী, দৃঢ়চেতা। তার অমতে একজন বৃদ্ধের সঙ্গে জোর করে বিয়ে দেয়া হয়েছে বলে সে বিয়ের রাতে ঘর ছেড়ে পালায় এবং জমিদার হাতেম আলীর বজরায় আশ্রয় নেয়। স্ত্রীর সন্ধানে বেরিয়ে পীর সাহেবও পৌঁছে যান এই বজরায়। কিন্তু ফেরাতে পারেননি তাহেরাকে। বোঝাতে পারেননি হাতেমপুত্র হাশেমকে, যার কাছে সামাজিক ও ধর্মীয় প্রথা বা বিশ্বাসের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হৃদয়বৃত্তি। হাশেম তাহেরাকে সঙ্গে নিয়ে পুরাতন জরাজীর্ণ জীবনকে পেছনে ফেলে নতুন জীবনের পথে পা বাড়ায়। নাট্যকার এখানে পুরাতন ও সংস্কারাচ্ছন্ন জীবন থেকে মুক্তির পথ দেখিয়েছেন, ধর্মীয় কুসংস্কারের জাল ছিন্ন করে মানবতার জয়গান গেয়েছেন এবং আত্মমর্যাদা-বোধসম্পন্ন চরিত্রের প্রতিষ্ঠাও দেখিয়েছেন। নির্ভীক, দৃঢ়চেতা তাহেরা পীর সাহেবের উদ্দেশ্যে বলে :

> আমাকে বিবি ডাকবেন না। বিয়েতে আমি মত দিই নাই। আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে হয় নি। ... আমার বাপজান আর সৎমা আপনাকে খুশি করবার জন্য আপনার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন। ... আপনি পুলিশে খবর দিতে পারেন, আপনি আমার বাপজানকে ডেকে পাঠাতে পারেন, আমার ওপর জুলুম করতে পারেন। কিন্তু আমি আপনার সঙ্গে যাব না। (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, ১৯৯৬ : ২২)

বস্তুত, *বহিপীর* নাটকের পটভূমিকা সংস্কারাচ্ছন্ন পশ্চাৎপদ পল্লিসমাজ হলেও এখানে আধুনিক নর-নারীর আত্মঅধিকারের দাবির প্রতিফলন ঘটেছে। সেই সঙ্গে মানবিক

অধিকারের দাবিতে পীর-মুর্শিদে ভক্তির সংস্কারে শৈথিল্য এসেছে, তারও ইঙ্গিত রয়েছে এই নাটকে (নীলিমা ইব্রাহীম, ১৯৭২ : ৪৮১)। বক্তব্য উপস্থাপনে, চরিত্র চিত্রণে, সংলাপ রচনায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *বহিপীর* নাটকটি সমাজসচেতন নিরীক্ষামূলক নাটক হিসেবে সাফল্যের দাবিদার।

অর্থনৈতিক সমস্যা ও সংকট সম্বলিত একাধিক নাটক রচিত হয়েছে এ সময়ে। অর্থনৈতিক অব্যবস্থা ও অসমবণ্টনের ফলে সমাজে যে শ্রেণিবৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে এবং একশ্রেণির মানুষ চরম হতাশা ও বঞ্চনায় দিনাতিপাত করে চলেছে, এই সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয়তার ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে আনিস চৌধুরীর (১৯২৯-১৯৯০) বিখ্যাত নাটক *মানচিত্র* (১৯৬৩), *এ্যালবাম* (১৯৬৫); আসকার ইবনে শাইখের *অনুবর্তন* (১৯৪৩), *বিল বাওড়ের ঢেউ* (১৯৬০); নুরুল মোমেনের (১৯০৬-১৯৮৯) *যদি এমন হোত* (১৯৬০), *আইনের অন্তরালে* (১৯৬৭), *শতকরা আশি* (১৯৬৭); আ.ন.ম. বজলুর রশীদের (১৯১১-১৯৮৬) *শিলা ও শৈলী* (১৯৬৬) প্রভৃতি নাটক।

আনিস চৌধুরীর *মানচিত্র* সমাজ-সংস্কারমূলক নাট্য-ধারার অত্যন্ত আলোচিত একটি নাটক। বাস্তবঘনিষ্ঠ এ নাটকে দারিদ্র্যের নির্মম নিষ্পেষণে জর্জরিত একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের করুণ চিত্র আমরা খুঁজে পাই। দরিদ্র স্কুল মাস্টার মজিদের বিরাট সংসার, অভাব-অনটন লেগেই থাকে। পয়সার অভাবে ছেলের পড়ালেখা হয় না, মেয়ের বিয়ে দিতে পারে না। দুমুঠো অন্নের সংস্থান করাই যখন দুঃসাধ্য প্রায়, দুর্নীতিপরায়ণ স্কুল সেক্রেটারি তখন হেডমাস্টারের মাধ্যমে মজিদকে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করতে চায়। হেডমাস্টার মনসুরের বক্তব্য :

> আপনার মতো অথর্ব অশথ গাছ জিইয়ে রেখে কোন লাভ আছে? শুধু লোকসান। আমি নতুন চারা লাগাব। পুরনো অকর্মণ্য লোক নিয়ে আমার চলবে না। এটা চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারি নয়– স্কুল, বুঝলেন? (আনিস চৌধুরী, ১৯৯৪ : ৪৬৮)

মজিদ মাস্টারের কোনো অনুরোধই আর কানে তোলে না স্কুল কর্তৃপক্ষ। চাকুরি চলে যায় তার। দুঃখে, কষ্টে, অনাহারে তার স্ত্রী মারা যায়। এরই মধ্যে রাণু ও কামাল নতুন জীবনের স্বপ্ন বোনে। *মানচিত্র* নাটকে নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের বাস্তব রূপটি আমরা খুঁজে পাই। জীবনঘনিষ্ঠ *মানচিত্র*-এর চরিত্রগুলো আমাদের অত্যন্ত পরিচিত এবং বাস্তবানুগ। কাহিনিগ্রন্থন ও সংলাপসৃজনে নাট্যকারের আবেগ কাজ করেছে।

একই বিষয়ের ওপর আনিস চৌধুরীর দ্বিতীয় নাটক *এ্যালবাম*। অর্থনৈতিক মাপকাঠিতে আমাদের সমাজে শ্রেণিকরণ করা হয়। বিত্তের পরিমাণ নির্ধারণ করে কে উচ্চবিত্ত, কে মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত। মানুষকে মূল্যায়ন করা হয় বিত্তের মানদণ্ডে। আর তাই *এ্যালবামে* দেখি মুস্তাফা অনায়াসে অপদস্থ করে সামান্য বেতনভোগী অধ্যাপককে।

কখনো বিত্তবান ব্যবসায়ীর কন্যার কথায় ফুটে ওঠে অর্থের অহংবোধ। মূলত অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে তৈরি হওয়া বিভিন্ন শ্রেণির মানুষকে উপস্থাপন করা হয়েছে এই নাটকে। সমালোচকের মতে, এই নাটকের কাহিনি সুগ্রন্থিত নয়, নাটকীয় উৎকণ্ঠা অনুপস্থিত এবং *এ্যালবাম* আনিস চৌধুরীর দুর্বল সৃষ্টি (সুকুমার বিশ্বাস, ১৯৯৮ : ২৪৪)। সবকিছুর পরেও ইনামের আদর্শ ও রুবির দৃঢ়চেতা মনোভাব আকর্ষণীয়।

অর্থনৈতিক অব্যবস্থার ফলে উদ্ভূত সংকটের পাশাপাশি এই সংকট থেকে উত্তরণের পথ দেখিয়েছেন নাট্যকার আসকার ইবনে শাইখ তাঁর *বিল বাওড়ের ঢেউ* নাটকটির মাধ্যমে। জেলে সমাজ নানারকম শোষণের কবলে পড়ে মানবেতর জীবনযাপন করে। তাদের দুর্দশাগ্রস্ত জীবনের খণ্ডচিত্র অঙ্কিত হয়েছে এই নাটকে। তবে, এই দুঃখ মোচনের উপায়ও নির্দেশ করেছেন নাট্যকার। নাট্যকার মনে করেন 'সমবায় সমিতি' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জেলেরা তাদের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারবে। এই নাটকের কাহিনি সরল ও সংলাপ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ।

নিম্নবিত্ত কেরানি আজমত আলীর বহু সদস্য-বিশিষ্ট পরিবারের অভাব-অনটনের কাহিনি নিয়ে নাট্যকারের অপর রচনা *অনুবর্তন*। পঞ্চাঙ্ক বিশিষ্ট এই নাটকে সমাজের একটি শ্রেণির প্রকৃত দুরবস্থা ফুটে উঠেছে।

শ্রেণিবৈষম্য দূর করতে, অশিক্ষা ও অনাহার দূর করতে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী যদি এক হয়ে কাজ করত– এরকম একটি প্রত্যাশা ব্যক্ত হয়েছে নুরুল মোমেনের *যদি এমন হোত* নাটকটিতে। পঞ্চাঙ্ক বিশিষ্ট এই নাটকে সুশিক্ষিত, আত্মবিশ্বাসী, উদ্যমী যুবক ফয়েজ দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে সবার আগে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে। গ্রামের স্কুলে হেডমাস্টারের চাকুরি নিয়ে সেই গ্রামের অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করার, আদর্শ মানুষরূপে গড়ে তোলার ব্রত পালন করে সে। তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে ধনীকন্যা ইয়াসমীন। সমাজের উন্নয়নে যুবক-যুবতীর এই প্রয়াস প্রশংসনীয়। নাট্যকার এখানে সমাজ-সংস্কারে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। *শতকরা আশি* নুরুল মোমেনের নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রচেষ্টার ওপর রচিত একটি প্রচারধর্মী একাঙ্ক নাটক। বাংলাদেশের শতকরা আশি জন লোক যেখানে অশিক্ষিত, সেখানে জ্ঞানের মশাল না জ্বালালে এদেশ চিরকাল অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকবে। বস্তুত, নীতিবান ও আদর্শবান ব্যক্তিদের নাট্যকার নিরক্ষরতা বিষয়ে অবদান রাখতে উৎসাহিত করেছেন।

শিলা ও শৈলী নাটকে আ.ন.ম. বজলুর রশীদ সামাজিক বৈষম্য ও অবক্ষয় ঠেকাতে যৌথ খামার ও সমবায় সমিতির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন। নাট্যকার মনে করেন, সমবায় ও যৌথ খামারের মাধ্যমে চাষাবাদ করলে এদেশের সমৃদ্ধি অবধারিত। তাই

মিনা, হিকমত ও মামুজী মিলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও উৎপাদন বৃদ্ধি এই ত্রিমুখী পরিকল্পনায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করে। নাটকে আছে কামালের মত আদর্শবাদী যুবক, যে কৃষিবিদ্যায় উচ্চশিক্ষা নিয়েও এই সমিতিতে যোগ দিয়েছে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে। অথচ, হিকমত সমিতির সভাপতি হওয়া সত্ত্বেও একজন প্রবঞ্চক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু সমাজে মামুজীর মত সৎ, নিষ্ঠাবান, ত্যাগী মানুষের সংখ্যাই বেশি। সংখ্যালঘু হিকমতেরা সেখানে দুর্বল। তাই, প্রচারধর্মী এই নাটকে কৃষি পদ্ধতির আলোচনা ছাড়াও সমাজ-সচেতনতা সৃষ্টি ও সমাজ-সংস্কারের পথ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। মামুজীর স্বপ্ন যেন এদেশের প্রতিটি মানুষের আত্মার প্রতিধ্বনি :

> মামুজী : আমি সারাজীবন স্বপ্ন দেখেছি ... দেশের দশ কোটি মানুষ খেয়ে পরে সুন্দরের পরিচর্যা করে বাঁচবে, বাঁচার মতো বাঁচবে ... একজনের সুখ, সুখ নয়, দশ জনের মিলিয়ে যে সুখ, যে আনন্দ তা জীবন ও জগতকে সার্থক ও সুন্দর করে তোলে। (আ.ন.ম. বজলুর রশীদ, ১৯৬৬ : ৬২)

সমকালীন সমস্যাকে চিহ্নিত করে সমাজসচেতন নাট্যকাররা কখনো-কখনো ব্যঙ্গ ও প্রহসনধর্মী নাটকের মাধ্যমে তা প্রকাশ করেছেন। শওকত ওসমানের (১৯১৭-১৯৯৮) *আমলার মামলা* (১৯৪৯) ও *কাঁকরমনি* (১৯৪৯) এই ধারার নাটক। মুনীর চৌধুরীর *স্বামী সাহেবের অনশন ব্রত*, *বেশরিয়তি* বা *একতলা-দোতলা* নাটকের নামও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

পঞ্চাশের দশক ছিল অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ একটি সময়। দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ এদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এনেছে ব্যাপক পরিবর্তন। প্রশাসন যন্ত্রের সর্বত্র অনিয়মের কারণে একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী অন্যায়ভাবে বিত্তের পাহাড় গড়ে তোলে। শওকত ওসমানের *কাঁকরমনি* প্রহসনে কৌতুকাবরণে এই চরম সত্যটি বেরিয়ে এসেছে। চালের ব্যবসায়ী সোলেমান চালের মধ্যে কাঁকর মেশাত বলে নাট্যকার তার নাম দিলেন *কাঁকরমনি*। কাঁকর ও বালি মিশিয়ে চালের ওজন বাড়িয়ে সে অন্যায়ভাবে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিল। তাকে এ কাজে সহযোগিতা করেছে সরকারি নীতিহীন, আদর্শহীন কিছু কর্মচারি-কর্মকর্তা। তাদেরকে উৎকোচ প্রদান করে সোলেমান নির্বিঘ্নে তার কুকর্ম পরিচালনা করত। সমকালীন এই সমস্যাকে নাট্যকার ব্যঙ্গ, শ্লেষ ও কৌতুকের মাধ্যমে চিত্রিত করেছেন। তবে পঞ্চাঙ্কের এই প্রহসনে প্রধান ত্রুটি হল দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজব্যবস্থা নিয়ে নাটক শুরু হলেও শেষ পর্যন্ত এই বিষয়ের কোনো উল্লেখ নেই বরং প্রেম ও পরিণয় দিয়ে নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। নাট্যকার হয়ত এই অপ্রিয় সত্যটি প্রকাশ করতে চেয়েছেন যে, ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় মানব-মানবীর প্রেমও অর্থনৈতিক কাঠামোয় পরিমাপিত হয় এবং পরিশেষে অর্থসম্পদই মুখ্য হয়ে ওঠে। নাটকটির কাহিনি বাস্তবানুগ, সংলাপ শক্তিশালী ও চরিত্রের অনুগামী। *কাঁকরমনি* আকর্ষণীয় ও উল্লেখযোগ্য একটি প্রহসন।

চার অঙ্ক বিশিষ্ট *আমলার মামলা* প্রহসনটিও উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের নৈতিক অধঃপতন ও আদর্শহীনতার পরিচয়বাহী। দুর্নীতিপরায়ণ ও দুশ্চরিত্র সরকারি আমলা এবং তাদের সেবাদাস চাটুকারেরা শোষণ ও জুলুমের মাধ্যমে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি করে চলেছে। আখুনজী সেরকম একজন ব্রিটিশ তাঁবেদার, যে সরকারের উচ্চমহলকে খুশি রাখতে নিজের স্ত্রীকে ব্যবহার করতেও পিছ্‌পা নয়। সমালোচকের মতে :

> ব্রিটিশ পদলেহনকারী মি. আখুনজী ট্র্যাজিক চরিত্রে পরিণত হতে পারতো। একদিকে ব্রিটিশ প্রশাসনের প্রতি অবিচল ভক্তি, অপরদিকে নতুন দেশকাল, তার পরিবেশ এবং অন্যদিকে তার ইংরেজভক্তির প্রতি স্ত্রী-কন্যা, আত্মীয়-স্বজনের কটাক্ষে আখুনজীর হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হতে পারতো। নাটকে সৃষ্টি হতে পারতো গভীরতর এক ত্রিমুখী সংকট। কিন্তু নাট্যকার এ-সুযোগ যথাযথভাবে গ্রহণ করেন নি। (সুকুমার বিশ্বাস, ১৯৯৮ : ৮২)

নাটকটিতে শোয়েব দুর্নীতি ও আদর্শহীনতার বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। সংলাপ সৃজনে ও শব্দ চয়নে দক্ষতার পরিচয় রয়েছে *আমলার মামলা* নাটকটিতে।

মুনীর চৌধুরীর *স্বামী সাহেবের অনশন ব্রত* এবং *বেশরিয়তি* এবং *একতলা-দোতলা* নাটকগুলোতে সমাজ-জীবনের নানা অসঙ্গতি হাস্যরস ও কৌতুকের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। *স্বামী সাহেবের অনশন ব্রত* নাটকটিতে নারী ও পুরুষের সম-অধিকারের বিষয়টি বিবৃত হয়েছে। সম-অধিকার বোধটি নিয়ে এ সমাজের লোক যে কতটা উদাসীন ও অজ্ঞ, সে সম্পর্কে এই নাটকে কটাক্ষ করা হয়েছে। 'নাটকটি একটি উর্দু নাটকের ভাব অবলম্বনে রচিত' সুকুমার বিশ্বাস, ১৯৯৮ : ৯১। *বেশরিয়তি* নাটকে রঙ্গ-ব্যঙ্গের মাধ্যমে তৎকালীন মুসলিম সমাজে নারীদের পশ্চাৎপদ অবস্থানের প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে। পর্দাপ্রথার কারণে তাদের অনগ্রসরতা, পুরুষ-শাসিত সমাজ-ব্যবস্থায় তাদের শিক্ষা ও স্বাধীনতার সংকট, আচারের রক্ষণশীলতা ইত্যাদি বিষয় হাস্যরসে সিক্ত হয়েছে আলোচ্য একাঙ্কিকায়।

একতলা-দোতলা একাঙ্ক নাটকের বিষয়বস্তু সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অসঙ্গতি। দোতলার অবাঙালি তরুণীর সঙ্গে একতলার বাঙালি তরুণের বিরোধ, সংঘাত ও অবশেষে মিলন নিয়ে রচিত হয়েছে এই কৌতুক নাট্যটি। নাটকটিতে রসিকতার আড়ালে রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায় :

দুলাভাই : সাবাস, সাবাস, জোয়ান। বাঙালির মুখ রক্ষা করেছ। এইতো চাই। কেবল মুখ বুঁজে সহ্য কর বলেই, ওদের সাহস এত বেড়ে গেছে।

বশীর খোতা মুখ ভোঁতা করে দিতে আমরাও জানি।

দুলাভাই : জানলেই হবে। না জানলে টিকে থাকবে কী করে? চুপ করে সব মেনে যাও বলেই ওরা ভাবে আমরা ভীরু দুর্বল। রুখে দাঁড়াও দেখবে সব ঠাণ্ডা। (মুনীর চৌধুরী, ১৯৮২ : ৩১৩)

মুনীর চৌধুরীর কৌতুকনাট্যের বিষয়বস্তু ও বক্তব্য জটিলতামুক্ত এবং রীতি-মনোহারী। সংলাপ রচনায় রয়েছে নবতর ভঙ্গি। পরিশেষে বলা যায়, তাঁর রচিত রঙ্গ-ব্যঙ্গ নাটকগুলো নাটকীয় রসাস্বাদে আমাদের উজ্জীবিত করে।

২.২ বাংলাদেশ পর্ব

স্বাধীনতা-পরবর্তী স্বাধীন বাংলাদেশে শ্রেণি-বৈষম্যকে গুরুত্ব দিয়ে রচিত হয়েছে একাধিক নাটক। যেখানে স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশের সমাজ-সমালোচনামূলক নাটকগুলোতে অশিক্ষা, অভাব, কুসংস্কার ইত্যাদির বিপক্ষে লেখনী ধারণ করেছিলেন নাট্যকারগণ, সেখানে এই পর্বে শ্রেণি-বৈষম্যকে তুলে ধরা, এর স্বরূপ বিশ্লেষণ করা এবং কখনো কখনো এই সঙ্কট মোকাবেলার পথ খুঁজে পাবার চেষ্টা রয়েছে নাটকগুলোতে। কখনো কখনো সামাজিক সমস্যা ও তার সমালোচনাই পেয়েছে মুখ্য গুরুত্ব।

আবদুল্লাহ আল মামুনের *এখন দুঃসময়* (১৯৭৪) সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের বিপর্যস্ত আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের ওপর লেখা। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কাঠামো তখন দুর্বল, তার ওপর হানা দিয়েছে সর্বগ্রাসী বন্যা। ফলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং জনজীবনে ভীষণ দুর্ভোগ নেমে আসে। মানুষের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে ন্যায়-নীতি বর্জিত কিছু অসৎ মানুষ কালোবাজারি, মজুতদারিতে মেতে উঠলে এই দুর্ভোগ চরমে পৌঁছায়। এরকম বাস্তবতায় রচিত হয়েছে নাটকটি। নাটকটিতে অসৎ, অসাধু ও লম্পট চরিত্রের মুখোশ উন্মোচন করা হয়েছে এবং অন্যায়কারীকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। অন্যায়কারীর শাস্তি আমাদের মনে একধরনের মানসিক তৃপ্তি নিয়ে আসে এবং আমরা ভবিষ্যতের অনাবিল স্বপ্নে উদ্বেলিত হই। নাট্যকারের উদ্দেশ্য দুটি– একটি কপট, বকধার্মিক অসাধু লোকদের চিহ্নিত করা এবং দুই, তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা।

নাটকের শুরুতেই একটি অস্থির সময়ের সাক্ষাৎ পাই আমরা, যেখানে লোকজন ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছোটাছুটি করছে এবং এরই মাঝে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে কিছু হেডলাইন :

হেডলাইন : 'রাজধানীতে বন্যার পদধ্বনি'
'চালের মণ একশ আশি'
'বুড়িগঙ্গার পানি আরও বাড়বে'
'চালের মণ দুশ টাকা'
'বাকল্যান্ড বাঁধ উপচে হু হু করে পানি ঢুকছে'
'চালের মণ দুশ চল্লিশ'...
'চালের মণ দুশ ষাট'...
'চালের মণ দুশ আশি' (আবদুল্লাহ আল মামুন, ২০০০ : ৫৩)

বন্যা ও দুর্ভিক্ষে মানুষের জীবন নিঃস্ব, রিক্ত। তার ওপর কালোবাজারি এবং মজুতদারদের দৌরাত্ম্যে চালের দাম বাজারে নিয়ন্ত্রণের বাইরে। সাধারণ মানুষ অভুক্ত থাকছে, দিনের পর দিন অনাহারে কাটাচ্ছে। সামান্য জমিজমা থাকলেও নেই নগদ পয়সা, যা দিয়ে চড়া মূল্যে হলেও খাবার কেনা যেতে পারে। ব্যাপারির মত অসাধু ব্যক্তি তখন নামমাত্র মূল্যে এদের কাছ থেকে তাদের শেষসম্বল জমিজমা ক্রয় করে নেয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সুযোগ নিয়ে ব্যাপারির মত লোকেরা সাধারণ মানুষের সর্বস্ব কেড়ে নেয়। *এখন দুঃসময়* নাটকটি মূল্যবোধের অবক্ষয়, নৈতিক স্খলন ইত্যাদির প্রামাণ্য দলিল। জরিনা এই নাটকের একমাত্র নারী চরিত্র যে ক্ষুধার জ্বালায় মুনসির প্ররোচনায় ব্যাপারির আস্তানায় আসে। জরিনা বেঁচে গিয়েছিল সোনার জন্য, সোনা তাকে রক্ষা করেছিল ব্যাপারির কবল থেকে। কিন্তু জরিনার মত অনেক মেয়ে শেষপর্যন্ত বাঁচতে পারে না লম্পট ব্যাপারিদের ছোবল থেকে। যে বন্যার পানিকে পুঁজি করে ব্যাপারি ফায়দা লুটছিল দফায় দফায়, সেই বন্যার পানিতেই দুর্বৃত্তের মৃত্যু নিশ্চিত করে ন্যায় ও সত্যের প্রতি সুবিচার করেছেন নাট্যকার। এই নাটকের সংলাপগুলো তীক্ষ্ণ ও বলিষ্ঠ। ব্যাপারির মত দুরাচারদের চিহ্নিতকরণ ও শাস্তির বিধান করে নাট্যকার সমাজ-সচেতনতার পরিচয় রেখেছেন।

সামাজিক সচেতনতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করছে আবদুল্লাহ আল মামুনের *সেনাপতি* (১৯৭৯) নাটকটি। আব্বাস আলী তালুকদার নামের জনৈক সুবিধাবাদী স্বার্থপর ব্যক্তি এই নাটকে একজন শিল্পপতির সেনাপতির ভূমিকায় আছে। শিল্পপতি হৃদয়বান, ভদ্র বিনয়ী মানুষ, আব্বাসকে তিনি বিশ্বাস করে অনেক দায়িত্ব দেন, প্রশ্রয় দেন। এম.এ. পাশ করা শিক্ষিত আব্বাস একসময় দীর্ঘ দিন বেকার ছিল। অর্থকষ্ট, ক্ষুধার জ্বালা, স্ত্রীর প্রতি দায়িত্ব পালন না করতে পারার ব্যর্থতা, বাড়িওয়ালার তাচ্ছিল্য সব মিলে আব্বাস আলী পরিণত হয় একটি বিক্ষুব্ধ চরিত্রে, স্বার্থসর্বস্ব ব্যক্তিতে। তাই, শিল্পপতির বিশ্বাসের মর্যাদা রাখার প্রয়োজন বোধ করেনি সে। শিল্পপতির পরিবারে, কারখানায় সর্বত্র সে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে, ঐক্য নষ্ট করে। কিন্তু, পরে কারখানায় শ্রমিকদের হাতেই তার করুণ মৃত্যু হয়।

সেনাপতি নাটকের কাহিনি ইতিহাসের চেতনাবিরোধী। কেননা, নাটকে শিল্পপতিকে দেখানো হয়েছে নির্বিবাদ ভালো মানুষ হিসেবে, যিনি শ্রম শোষণ করেন না। কিন্তু, আমরা দেখছি উৎপাদন যন্ত্রের ওপর ব্যক্তিমালিকানা থাকা অবস্থায় মালিকের সঙ্গে শ্রমিকের সম্পর্ক সবসময়ই শোষণ-বঞ্চনা আর অমানবিকতার। তাই এই দিক দিয়ে শিল্পপতিকে নিরেট ভালোমানুষ সাজানো খানিকটা অবাস্তব। তবে নাটকটির সংলাপ অন্যান্য নাটকের মত তীব্র ও মর্মস্পর্শী।

নাট্যকারের অপর সামাজিক সচেতনতামূলক নাটকের মধ্যে *তোমরাই* গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তিদের কারো কারো দ্বারা এদেশের সম্ভাবনাময় তরুণ সমাজ বিপথগামী হচ্ছে, বিভ্রান্ত হচ্ছে। কখনো কখনো অশুভ শক্তির দ্বারা তারা ব্যবহৃত হচ্ছে। নাটকে এরকমই একজন দেশের শত্রু, জনগণের শত্রু হায়দার আলীর মুখোশ জনসম্মুখে উন্মোচিত হয়েছে। আবদুল্লাহ্ আল মামুনের অন্য সামাজিক নাটকগুলোর মধ্যে রয়েছে *শপথ*, *কোকিলারা* ইত্যাদি।

শেখ আকরাম আলীর *লাশ '৭৪* (১৯৮২) একটি সময়োপযোগী সচেতনতা সৃষ্টিকারী নাটক। মুক্তিযুদ্ধোত্তর সমাজবাস্তবতা এই নাটকের প্রেক্ষাপট। নাটকের জমসেদ মাস্টার একজন সৎ ও আদর্শবান চেয়ারম্যান। স্ত্রী সহিদন এবং মেয়ে ফাতেমাকে নিয়ে তার সংসার। বড়ভাই হাজী মুকসেদ '৭১-এর রাজাকার। বর্তমানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমা লাভ করে স্বাধীন। দুজন মুক্তিযোদ্ধা ফারুক ও হাসমত– যারা স্বাধীনতা সংগ্রামে সহযোদ্ধা ছিল। স্বাধীনতা অর্জনের পর অস্থির সামাজিক প্রেক্ষাপটে হাসমত বিপথগামী হয়। হাজী মুকসেদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে অসৎ উপায়ে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা উপার্জন করতে শুরু করে। অথচ মুক্তিযোদ্ধা ফারুক দেশ গড়ার কাজে নিবেদিতপ্রাণ। গ্রামাবাসীদের শিক্ষা ও চেতনার সম্প্রসারণ তার লক্ষ্য। বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র হাজী মুকসেদ ও বিপথগামী মুক্তিযোদ্ধা হাসমতের অবৈধ টাকা উপার্জনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় জমসেদ। কোনোভাবেই মাস্টারের নীতি ও আদর্শ থেকে তাকে সরানো যাচ্ছে না। তখন স্বার্থপর, বিবেকহীন সেই অপশক্তি ষড়যন্ত্র করে হত্যা করে জমসেদ মাস্টারকে। শুধু তাই নয়, মাস্টারের জায়গা-জমি ও থাকবার ঘরটি পর্যন্ত কৌশলে হাত করে নেয় হাজী মুকসেদ। পথে নামতে হয় সহিদন ও ফাতেমাকে। ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে শহরে কাজের সন্ধানে ছুটে আসে মাস্টারের স্ত্রী সহিদন। বাধ্য হয়ে মেয়েকে দিয়ে দেয় একজন অচেনা লোকের হাতে, লোকটি সহিদনকে কথা দেয় ফাতেমাকে সে নিঃসন্তান ডাক্তার পরিবারের নিরাপদ আশ্রয়ে দিয়ে আসবে। যাবার আগে টিফিন ক্যারিয়ারে করে সহিদনকে ভাত দিয়ে যায় লোকটি। কিন্তু দীর্ঘদিন খেতে না পারা সহিদন গোগ্রাসে ভাত গিলতে থাকলে বিষম খায় এবং কাশতে কাশতে দম আটকে মারা যায়।

নাটকের প্রথম দৃশ্যটি শুরু হয় সহিদনের এই লাশটি নিয়ে যেখানে লাশটিকে বেওয়ারিশ বলা হয়। কিন্তু পরের দৃশ্যেই ফ্ল্যাশব্যাকের মাধ্যমে জানা যায় সহিদন একজন শিক্ষকের স্ত্রী, শহীদ মুক্তিযোদ্ধার মা। সুতরাং লাশটি বেওয়ারিশ হতে পারে না এবং দেশবাসী সবাই তার ওয়ারিশ বলে সাংবাদিক চরিত্রটি মত প্রকাশ করলে অর্ধ-উন্মাদ বৃদ্ধ জুলমত খাঁ বলে :

ওয়ারিশ। তোরা ওয়ারিশ? কে বলেছে তোরা ওয়ারিশ? ওয়ারিশের কি কর্তব্য তোরা পালন করেছিস? (শেখ আকরাম আলী, ১৯৮২ : ৩৯)

সত্যিকার অর্থে, সদ্য স্বাধীন দেশটির যুদ্ধ-বিধ্বস্ত চেহারায় যখন তার দায়িত্ব নেয়া জরুরি ছিল এদেশবাসীর কজন সে-দায়িত্ব পালন করেছে! বরং ফারুকের মত মুক্তিযোদ্ধা যারা দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিল তাদের অকারণে জেল খাটতে হয়েছে, জমসেদের মত নিষ্ঠাবান আদর্শ শিক্ষককে হত্যা করা হয়েছে। অথচ অসৎ অসাধু ব্যক্তিবর্গ গড়ে তুলেছে বিত্তের পাহাড়। তাই জুলমতের উক্তির মাধ্যমে নাট্যকারই তরুণ প্রজন্মকে স্বীয় দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে চেয়েছেন। নাটকটির কাহিনি গতিশীল। সংলাপ আবেগপূর্ণ ও চরিত্রানুগ। মুক্তিযুদ্ধোত্তর বিধ্বস্ত বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার একটি করুণ চিত্রায়ণ *লাশ '৭৪*।

১৯৭১-পরবর্তী সময়ে মানুষের নৈতিক অবক্ষয়ের ওপর ভিত্তি করে লেখা সৈয়দ শামসুল হকের *এখানে এখন* (১৯৮১) কাব্যনাট্য। এই নাটকের মর্মবাণী হল স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের মানুষ এখন স্পষ্টত দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত। একটি শ্রেণি ব্যবহার করছে, অপর শ্রেণিটি ব্যবহৃত হচ্ছে। মুষ্টিমেয় ব্যবহর্তার নিকট নিরন্তর ব্যবহৃত হচ্ছে বৃহৎ জনগোষ্ঠী। নাট্যকার বলেন, 'আমরা কি স্বাধীনতা এ কারণেই চেয়েছিলাম এবং এনেছিলাম, ভিন্ন দেশী ভিন্নভাষী ব্যবহর্তাকে সরিয়ে নিজেরাই তা হতে?' (সৈয়দ শামসুল হক, ১৯৯১ : ১৪২)। নাট্যকারের আক্ষেপ এখানে স্পষ্ট যে, ব্রিটিশ কিংবা পশ্চিম পাকিস্তানিদের এদেশ ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছিল যে বৈষম্যহীনতার প্রত্যাশায়, মুক্তির আকাঙ্ক্ষায়– তা স্বাধীন বাংলাদেশে রক্ষা করা যায় নি। স্বাধীন দেশে নিজেরাই এখন কেউ ব্যবহর্তা, কেউ বা ব্যবহৃত। নাটকের মূল চরিত্র পঁয়ত্রিশ বছরের অবিবাহিত পুরুষ রফিক প্রথম দিকে 'ব্যবহৃত' থাকলেও শেষের দিকে নিজেই 'ব্যবহৃত' হয়ে যায়। রফিকের বন্ধু অর্থলিপ্সু নাসির নিজে ওপরে ওঠার জন্য ব্যবহার করেছে সাধারণ গরিব মানুষকে, জৈবিক প্রয়োজনে ব্যবহার করেছে অসহায় পতিতা মিনতিকে। গাফ্‌ফারের সংসারে ব্যবহৃত হয়েছে সুলতানা। আবার, গাফ্‌ফার ব্যক্তিগত সমৃদ্ধির নেশায় ধর্মকে ব্যবহার করে। আর রফিকের অভিযোগ, সুলতানা যে গাফ্‌ফারের সংসার ত্যাগ করে রফিককে বিয়ে করতে সম্মত হয়েছিল তা রফিককে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যেই। মূল কথা, স্বার্থান্ধ মানুষেরা নিজেদের স্বার্থে ক্রমাগত ব্যবহার করে যাচ্ছে অন্যদের। ক্ষমতার লোভে, বিত্তের প্রয়োজনে, ব্যক্তিগত সুখ-সমৃদ্ধির আশায় এখানে এখন 'ব্যবহার ব্যবহার করে আর ব্যবহৃত ব্যবহৃত হয়' (সৈয়দ শামসুল হক, ১৯৯১ : ১৭৬)। কাব্যময় বর্ণনা এবং বলিষ্ঠ সংলাপে *এখানে এখন* অতুলনীয়।

সমকালীন নাটকগুলোর আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, '৭১ পরবর্তী সময়ে মূল্যবোধের অবক্ষয়, চোরাকারবারি, মজুতদারি, দুর্নীতি ইত্যাদি সঙ্কটে

পড়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটি আরও গভীর সঙ্কটে আবর্তিত হচ্ছিল। রশীদ হায়দারের *তৈল সঙ্কট* (১৯৭৩) সে-রকম অস্থির সময়ের একটি প্রতিচ্ছবি। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় সদ্য স্বাধীন এই দেশটিতেও তীব্র তেল সঙ্কট দেখা দিয়েছিল। হাবিবুর রহমান একজন চাকুরিজীবী, ভাড়া থাকেন রেশনের ডিলারের বাড়িতে। কেরোসিন তেলের সঙ্কটের কারণে তিন টিন কেরোসিন কিনে এনে তিনি দুর্দিনের জন্য সঞ্চিত রাখেন। বাড়ির নিচে ডিলারের দোকান, সেখানে রাত হতে কেরোসিনের লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছে বঞ্চিত লোকজন। ডিলার আলিমুদ্দিন কয়েকজনকে তেল দিয়ে জানিয়ে দেয় আর তেল নেই। ক্ষোভে-ক্রোধে জনতা আলিমুদ্দিনকে মারতে চাইলে সে প্রাণভয়ে পালিয়ে যায়। বিক্ষুব্ধ জনগণ আলিমুদ্দিনকে খুঁজতে হাবিবুরের বাড়িতে উপস্থিত হয়। সেখানে আকালের জন্য সঞ্চিত সেই তিন টিন কেরোসিন মজুদ দেখে উত্তেজিত জনতা নির্দোষ হাবিবুরকেই পিটিয়ে হত্যা করে ফেলে। ভাগ্য-বঞ্চিত মানুষগুলোর মানবতার সঙ্কটও এই নাটকের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আলিমুদ্দিন আখন্দ, যে তেল থাকা সত্ত্বেও মানুষগুলোকে উপেক্ষা করল, সে পালিয়ে বাঁচল, অধরাই থেকে গেল সাধারণ জনতার। কিন্তু সাধারণ চাকুরিজীবী, ভবিষ্যতে সামান্য সুবিধার জন্য কিঞ্চিৎ তেল মজুদ রাখায় তাকে প্রাণ পর্যন্ত দিতে হল। সমাজের তথাকথিত আলিমুদ্দিনরা থাকেন ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, দুর্ভোগ পোহাতে হয় সাধারণ মানুষদের, নাটকে এই সারসত্যটি উদ্ভাসিত। কাহিনি ও সংলাপে জীবনঘনিষ্ঠ *তৈল সঙ্কট* নাটকটি সমাজ-সমালোচনামূলক নাটকের ধারায় বিশিষ্টতা অর্জনের দাবিদার।

সমকালীন সমাজ-বাস্তবতার তীব্র কটাক্ষ নিপুণ অঙ্কনে এস এম সোলায়মান (১৯৫৩-২০০১) একজন নাট্যকার। 'ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা, কূপমণ্ডুকতা, আমলাবেষ্টিত সামরিক স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে এস এম সোলায়মানের কলম ব্যঙ্গ-কৌতুকে, বিদ্রূপে ক্ষুরধার, দুঃসাহসী সংলাপে-চিত্রে নিয়ত জাগর' (সেলিম মোজাহার, ২০০৮ : ৩৪)। যে সামাজিক-অর্থনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় স্বাধীনতা এনেছিল এদেশের মানুষ, মূলত তাদের সে প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। ক্ষমতার হাতবদল হয়েছে কেবল, ক্ষমতাকাঠামো পরিবর্তিত হয়নি। 'পাকিস্তানি আমলের আর্থ-উৎপাদন কাঠামো ও তার নিয়ন্ত্রণী শক্তি কেবল পুনর্বহাল হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশে, যা প্রগতির পথকে বাধাগ্রস্ত করেছে' (রফিকউল্লাহ খান, ১৯৯৭ : ২০৫)। এস এম সোলায়মানের *গণিমিয়া একদিন* (১৯৮৬) নাটকে এই সমাজবাস্তবতাই উন্মোচিত হয়েছে। পাশাপাশি মুখোশধারী রাজনীতিক, ভ্রষ্ট সমাজহিতৈষীদেরও নাট্যকার চিহ্নিত করেছেন এই নাটকে। নেয়ামত মণ্ডলের মেয়ের আকিকা উৎসবে গ্রামবাসীর সম্মুখে জামাত মোহাম্মদের অকপট স্বীকারোক্তি :

> জামাত : মন্ত্রী-গভর্নরের সাথে আমার দোস্তি আছে। তবে এই দোস্তি সেই দোস্তি নয়। ইহা হইতেছে গিয়া টেকার দোস্তি। অর্থাৎ ক্যাশ টাকা গুনিয়া দিয়া মন্ত্রী বানাই। পরে ছোবড়া বানাইয়া ছাড়িয়া দিই। মন্ত্রী বানাইতে যেই টাকা

> ইন্‌ভেস্ট করি তাহার শতগুণ উসুল করিয়া লই। শিক্ষিত লোকের ভাষায় ইহাকে মোস্ট প্রপিটেবল ডিগনিফাইড ব্যবসা বলে। কারেন্ট ব্যবসার জন্য সরকারী দলকে টাকা দিয়া কিনি এবং ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিরোধী দলকেও বঞ্চিত করি না। (এস এম সোলায়মান, ২০০২ : ১০৫)

এই ভণ্ড রাজনীতিকরা টাকা দিয়ে গরিব মানুষের ভোট কিনে নেয়, জোর করে ক্ষমতায় যায় এবং জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার সুরক্ষার ছলে স্বৈরতন্ত্র বজায় রাখে। নাটকের নায়ক গণিমিয়া এই অসুস্থ-বিকারগ্রস্ত সমাজব্যবস্থার বিপক্ষে অবস্থান নেয়, বিদ্রোহ ঘোষণা করে, ফিরে পেতে চায় তার হারানো সব অধিকার। সংলাপ রচনায় এস এম সোলায়মান স্পষ্টভাষী, দুঃসাহসী। আমলাবেষ্টিত স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে নাট্যকারের অবস্থান অত্যন্ত দৃঢ়।

জিয়া হায়দারের *শুভ্রা সুন্দর কল্যাণী আনন্দ* (১৯৭০), *এলেবেলে* (১৯৮২); মান্নান হীরার *ইঁদারা*, *একাত্তরের ক্ষুদিরাম*, *বটবৃক্ষ*; আবদুল্লাহ আল মামুনের *মেরাজ ফকিরের মা* (১৯৯৫); নাসির উদ্দীন ইউসুফের *একাত্তরের পালা* (১৯৮৭); সেলিম আল দীনের *আতর আলীর নীলাভ পাট* (১৯৭৫) ইত্যাদি নাটক সমাজ-সমালোচনা ও সচেতনমূলক নাটকের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

সমাজ-বাস্তবতাভিত্তিক নাট্যরচয়িতারা তাদের বক্তব্য প্রকাশের ক্ষেত্রে কখনো কখনো ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও তীক্ষ্ণ শ্লেষের আশ্রয় নিয়েছেন। কখনো-বা প্রতীকী ব্যঞ্জনায় হাস্যরসের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন নির্মম বাস্তবতা। স্বাধীন-পূর্ববর্তী সময়ে ব্যঙ্গধর্মী নাটক রচনার যে ধারার সূচনা হয়েছিল শওকত ওসমান, মুনীর চৌধুরী প্রমুখের নাটকের মাধ্যমে, স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে সে-ধারায় পূর্ণ সফলতা পেয়েছেন সেলিম আল দীন (১৯৪৮-২০১০), মমতাজউদ্‌দীন আহমদ প্রমুখ নাট্যকার। সেলিম আল দীনের *জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন* (১৯৭২), *সংবাদ কার্টুন* (১৯৭৩), *মুনতাসীর ফ্যান্টাসী* (১৯৭৫); মমতাজউদদীন আহমদের *রাজা অনুস্বারের পালা* (১৯৮৮), *হরিণ চিতা চিল* (১৯৭৪) ইত্যাদি এ ধারার নাটক।

জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন (১৯৭২) নাটকটি স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই লেখা। সবেমাত্র স্বাধীন হওয়া দেশটি তখন দুর্নীতির আখড়া। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, মূল্যবোধের অবক্ষয়, ভুয়া লাইসেন্স-পারমিটের ব্যবহার, পরিণামে একটি বিশেষ শ্রেণির কোটি টাকার মালিকানা পেয়ে যাওয়া, শ্রেণি বৈষম্য, বেকার ও ভিখিরির সংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে জনজীবনে তখন চরম দুর্ভোগ। জীবন দুর্বিষহ প্রায়। সেই দুর্ভোগ, অসহায়ত্ব কখনো রূপক-প্রতীক আবার কখনো অ্যাবসার্ড আবহে আলোচ্য নাটকে ফুটে উঠেছে।

জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন নাটকে দেখা যায়, পুরো শহর জুড়ে জন্ডিসের প্রকোপ, অথচ এর প্রতিকারের দিকে কারো নজর নেই। টাউনহলে নানান রঙের বেলুনের উৎসব

হচ্ছে। বেলুন এখানে প্রতীকী– যা রঙিন অথচ একদম হালকা, নিরেট নয়। জেনেভায় নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি সম্পর্কে বৈঠক বসেছে, সেখানে আণবিক যুদ্ধের ভয়াবহতা এবং বিশ্বশান্তির পথ প্রশস্তকরণ সম্পর্কিত আলোচনা হবে শুনে আগন্তুক বলে :

> আগন্তুক : ওটা বেলুনের বৈঠক। সমস্ত যুদ্ধ, সমস্ত ক্ষয়ের বিরুদ্ধে একটি হাস্যকর আয়োজন। উড়ছে বেলুন। এখানেও উড়ছে। আড়ালে নীল রক্তের অব্যর্থ রাত। কখনো দেখা যায় কখনো যায় না। উৎসাহ আলোড়ন অর্থহীন। অর্থহীন। ... আর এখন যুদ্ধ মানে বিশ্বযুদ্ধ ... বিবর্তন যক্ষার দিকে। অসুখ সর্বত্র। সব মহাদেশে ...। (সেলিম আল দীন, ১৯৮১ : ১২-১৪)

এভাবেই তীক্ষ্ণ শ্লেষের মাধ্যমে চরম অরাজক পরিস্থিতি ফুটিয়ে তুলেছেন নাট্যকার তাঁর নাটকে। যেখানে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, মিথ্যে আশ্বাস, প্রশাসনিক ব্যর্থতা ইত্যাদিতে নগরজীবন জন্ডিসের মত বিবর্ণ হয়ে গেছে। প্রায় একই ধরনের বিষয়ের ওপর লেখকের পরবর্তী ব্যঙ্গ নাটক *সংবাদ কার্টুন* (১৯৭৩), যেখানে নিয়ন্ত্রণহীন বিপর্যস্ত আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি সংবাদের কোলাজ চিত্রে প্রকাশিত হয়েছে। নাটকের শুরুতেই একজন লোকের তবলার ধ্বনিতে নাচের তালে তালে আগমন, তার হাতে ঢাকা শহরের মানচিত্র। তবলা থামলে সে ফ্রিজ হয় তখন সাবলীল ভঙ্গিতে ঘোষক এসে ঘোষণা করে :

> এটা ঢাকা শহরের মানচিত্র এবং তা নিজেই একটা শ্লোগান। ... ঢাকা শহর– জী হ্যাঁ, কালোবাজারী চোরাকারবারীর শহর, মুনাফাখোর, মজুতদারের শহর, হাইজ্যাকার, ব্যাঙ্কলুটেরা নকলবাজের শহর ... অবশ্য আমার মত নিরীহ মানুষেরাও এ শহরে থাকে। তাছাড়াও আছে, বেচারী মধ্যবিত্ত, ব্যর্থ প্রেমিক, হতাশ রাজনীতিক, গ্যাস্ট্রিকে ভোগা বুদ্ধিজীবী, জন্ডিসে ভোগা কবিকুল। ... দৈনিক তিনটি খুন, চারটি ধর্ষণ, পাঁচটি অপহরণ... (সেলিম আল দীন, ১৯৮১ : ২৩-২৪)

তারপর একে একে ছোট ছোট দৃশ্যের মাধ্যমে নাট্যকার তুলে ধরেছেন নৈরাজ্যময় পরিস্থিতি। যেমন– মুক্তিযোদ্ধাকে রাজাকার মনে করে উচ্ছৃঙ্খল জনতার আক্রমণ, পুলিশ কর্তৃক হাইজ্যাকারকে সহযোগিতা, প্রশাসনের দায়িত্বপূর্ণ পদকর্তাদের নির্বিকারত্ব, শিশুখাদ্যে ভেজাল মেশানো দুর্জনদের লোভ ও চক্রান্ত ইত্যাদি। এসব সমস্যায় জর্জরিত জনগণ নীরবে সব সয়ে যাচ্ছে, প্রতিবাদ করছে না। তাই কোনো প্রতিকারও হচ্ছে না। নাট্যকার হাস্যরসের মাধ্যমে নাগরিক জীবনের নানা জটিল সমস্যা উপস্থাপন করে জনসাধারণকে সচেতন করতে চেয়েছেন।

মুনতাসীর ফ্যান্টাসী (১৯৭৫), যা পরবর্তী সময়ে কেবলই *মুনতাসীর* নামে প্রকাশিত, সেলিম আল দীন রচিত স্যাটায়ারধর্মী নাটক। যেখানে অফিসের বড় কর্তাব্যক্তিটি জটিল ও হাস্যকর রোগে আক্রান্ত– যা কিছু দেখেন খেতে চান এবং খেয়ে ফেলেন। খাবারের পাশাপাশি অফিসের ফাইল, জানালার গ্রিল, শাসনতন্ত্র, তৈলচিত্র সবই খেয়ে

ফেলেন। মুনতাসীর অসুস্থ হলে তার পেটে অপারেশন করা হয় এবং তার পেট থেকে সব ধরনের উপকরণ বেরোতে থাকে। যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের পটভূমিতে লেখা *মুনতাসীর* নাটকে মুনতাসীর বিরাট শিল্পপতি। স্বাধীনতা পূর্বকালে তিনি ছিলেন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর অতি অল্প দিনে তিনি প্রচুর বিত্তের মালিক হয়ে যান। তিনি একজন সর্বগ্রাসী শোষক চরিত্র। নাট্যকার স্যাটায়ারের মাধ্যমে শোষক ও ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের গোগ্রাসে সব গিলে খাবার প্রবণতা ও লোভকে তুলে ধরেছেন এই নাটকে। 'তা ছাড়াও কেউ যদি এগুলোকে নিরপেক্ষ কৌতুক হিসেবে উপভোগ করেন, তাও অসংগত হবে না, নাটকের দিক থেকে' (অরুণ সেন, ২০০০ : ২৪)।

কৌতূহল-উদ্দীপক সংলাপ ব্যবহারের অনুভূতিগ্রাহ্য ও রূপকাশ্রয়ী নাটক *রাজা অনুস্বারের পালা* (১৯৮৮)। ১৯৭৪ সালে রচিত মমতাজ উদ্‌দীন আহমদের *রাজা অনুস্বারের পালা* কিছু পরিবর্তন ও পরিশীলনের মাধ্যমে ১৯৮৮-তে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এটি রূপক নাটক হলেও এর পাত্র-পাত্রীরা আমাদের চারপাশের চেনা চরিত্র। রাজা অনুস্বারের স্বৈরতন্ত্র, স্বার্থপরতা, নিপীড়ন, নির্যাতনের ফলে জনতার ক্ষোভ, জাগরণ এবং সম্মিলিত প্রতিবাদ আমাদের নিকট-অতীতের অভিজ্ঞতা স্মরণ করিয়ে দেয়। তীক্ষ্ণ ও ব্যঙ্গাত্মক সংলাপে সেই আর্থ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট উন্মোচিত হয়। রাজার সঙ্গে তাঁর প্রধান গুপ্তচর পাদটীকার কথোপকথন :

পাদটীকা : পাট্টামোট্টার মানুষ সংঘবদ্ধ হচ্ছে।

রাজা : কেন?

পাদটীকা : আপনার বিরুদ্ধে।

রাজা : ওদের নেতাকে ধরে নিয়ে এসো, ওকে প্রধানমন্ত্রী করে দাও। বিদ্রোহের মধ্যে বিলাস ঢুকিয়ে দাও, ... আন্দোলনকে নৃত্যে পরিণত কর। (মমতাজউদদীন আহমদ, ১৩৯৫ : ৩৩৯)

এই নেতাকে ইতিহাসের পাতা থেকে চিনে নিতে খুব বেগ পেতে হয় না। নাটকীয় আবেগ ও উৎকণ্ঠায় *রাজা অনুস্বারের পালা* অনন্য।

আলোচ্য নাট্যকারের আরেকটি ব্যঙ্গরসপূর্ণ নাটক *হরিণ চিতা চিল* (১৯৭৪)। নাটকে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা, এই ব্যবস্থায় সুবিধাভোগী শ্রেণি, দোদুল্যমান মধ্যবিত্ত শ্রেণি, সর্বহারা মানুষদের চিহ্নিত করেছেন নাট্যকার। পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটও উদ্ভাসিত হয়েছে এই নাটকে। সমকালীন সময়ের বিরুদ্ধ পরিবেশ কল্পিত ঘটনার আড়ালে, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে, কখনো-বা হাস্যরসের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে।

স্বাধীনতা-পরবর্তী রূপক-প্রতীকী নাটকের ধারায় বশীর আল হেলাল, আতিকুল হক চৌধুরী, হুমায়ুন আহমেদ, আল মনসুর প্রমুখ নাট্যকার সুখ্যাতি অর্জন করেছেন।

নাটকের গতি-প্রকৃতি ও বিভিন্ন ধারা নির্মাণে স্বাভাবিকভাবেই দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের প্রভাব স্বীকার্য। প্রেক্ষাপটের প্রধান প্রধান ঘটনাচক্র নাটক এবং নাট্যকারের মানসতায় আনে নানা পরিবর্তন। সুজলা-সুফলা, নদ-নদী বিধৌত বাংলাদেশের জনগোষ্ঠী চিরকালই কঠিন পরিশ্রমী এবং সংগ্রামী চেতনার ধারক। কাঙ্ক্ষিত ও ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য এই জনগোষ্ঠী চিরকাল অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। জনসংগ্রামের উত্তাপ, তার স্বরূপ এবং তা থেকে নাটক সৃষ্টির অনুপ্রেরণা সব সময়ই কার্যকর ছিল দেশপ্রেমী ও সৃষ্টিশীল নাট্যামোদীদের মাঝে। আবার কাঙ্ক্ষিত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে তারা কখনও কখনও সমাজের সমালোচনা করেছেন এবং নাটকের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সচেতন উপলব্ধি সৃষ্টির প্রয়াসী হয়েছেন। বাংলাদেশের নাটকে রাজনৈতিক ও সামাজিক চৈতন্য তাই ব্যাপ্তি ও ব্যঞ্জনায় বিস্তৃত ও বৈচিত্র্যময়।

গ্রন্থপঞ্জি

অরুণ সেন (২০০০)। *সেলিম আল দীন : নাট্যকারের স্বদেশ ও সমগ্র*। দুই বাংলার থিয়েটার প্রকাশন, বগুড়া।

আতাউর রহমান (১৯৭৬)। *সাঈদ আহমদের তিনটি* নাটক। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

আ.ন.ম. বজলুর রশীদ (১৯৬৬)। *শিলা ও শৈলী*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

আনিস চৌধুরী (১৯৯৪)। মানচিত্র। *শতবর্ষের নাটক*। ২য় খণ্ড [সম্পা. রশীদ হায়দার ও সৈয়দ শামসুল হক], বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

আনিসুজ্জামান (১৯৮২)। ভূমিকা। *মুনীর চৌধুরী রচনাসমগ্র-১*। [সম্পা. আনিসুজ্জামান]। অন্যপ্রকাশ, ঢাকা।

আবদুল হক (১৯৫৬)। অদ্বিতীয়া। নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা।

আবদুল্লাহ আল মামুন (২০০০)। *আবদুল্লাহ আল মামুন নাটকসমগ্র-১*। অন্যপ্রকাশ, ঢাকা।

আবদুল্লাহ আল মামুন (২০০১)। *সুবচন নির্বাসনে*। মুক্তধারা, ঢাকা।

আবদুল্লাহ আল মামুন (১৩৯৫)। *বাংলাদেশের নির্বাচিত* নাটক । মুক্তধারা, ঢাকা।

আবু হেনা মোস্তফা কামাল (১৯৯৯)। মুনীর চৌধুরীর নাটক। *বাংলাদেশে নাট্যচর্চার তিন দশক* । [সম্পা. রামেন্দু মজুমদার]। অন্যপ্রকাশ, ঢাকা।

আলমগীর খান (২০০৩)। মামুনুর রশীদের নাটক। *থিয়েটার*। [সম্পা. রামেন্দু মজুমদার]। ঢাকা ।

আসকার ইবনে শাইখ (১৯৫৩)। *দুরন্ত ঢেউ*। শান্তি প্রকাশনী, ঢাকা।

আসকার ইবনে শাইখ (১৯৯২)। বিদ্রোহী পদ্মা। *আসকার রচনাবলী*। ১ম খণ্ড। [সম্পা. আবিদ আজাদ ও মাহবুব হাসান]। শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা।

আহমদ শরীফ (২০০০)। প্রসঙ্গ সাতঘাটের কানাকড়ি। *আমার নাট্যভাবনা*। [সম্পা. মমতাজউদদীন আহমদ]। বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা।

এস এম সোলায়মান (২০০২)। *নির্বাচিত নাটক*। সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

কবীর চৌধুরী (১৯৯৯)। নাটক : প্রতিবাদ প্রতিরোধের। *বাংলাদেশে নাট্যচর্চার তিন দশক*। [সম্পা. রামেন্দু মজুমদার]। অন্যপ্রকাশ, ঢাকা।

কে. এম. রইস উদ্দিন (১৯৮৬)। *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা*। খান ব্রাদার্স এন্ড কোং, ঢাকা।

নীলিমা ইব্রাহীম (১৯৭২)। *বাংলা নাটক : উৎস ও ধারা*। নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা।

বিশ্বজিৎ ঘোষ (১৯৯৯)। বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের নাট্যসাহিত্যের ধারা (১৯৭১-১৯৯৫)। *বাংলাদেশের নাট্যচর্চার তিন দশক*। [সম্পা. রামেন্দু মজুমদার]। অন্যপ্রকাশ, ঢাকা।

বিশ্বজিৎ ঘোষ (১৩৯৪)। বাংলাদেশের পাঁচটি নাটক : প্রসঙ্গ গঠনশৈলী। *সাহিত্য পত্রিকা*। ত্রিংশ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, আষাঢ়। [সম্পা. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান]। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

মমতাজউদদীন আহমদ (১৩৯৫)। রাজা অনুস্বারের পালা। *বাংলাদেশের নির্বাচিত নাটক*। [সম্পা. রামেন্দু মজুমদার]। মুক্তধারা, ঢাকা।

মমতাজউদদীন আহমদ (১৯৯৯)। *নির্বাচিত নাট্যসম্ভার*। বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা।

মান্নান হীরা (১৯৯৭)। *আগুনমুখা*। এপিক বুক সেন্টার, ঢাকা।

মামুনুর রশীদ (১৯৯০)। *গিনিপিগ*। ৪র্থ প্রকাশ। মুক্তধারা, ঢাকা।

মামুনুর রশীদ (১৯৯৬)। *ওরা আছে বলেই*। ৪র্থ প্রকাশ। মুক্তধারা, ঢাকা।

মামুনুর রশীদ (২০০৫)। *ওরা কদম আলী*। মুক্তধারা, ঢাকা।

মাহবুবা সিদ্দিকী (১৯৯৩)। *সিকানদার আবু জাফর : কবি ও নাট্যকার*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

মুনীর চৌধুরী (১৯৮২)। একতলা-দোতলা। *মুনীর চৌধুরী রচনাসমগ্র-১*। [সম্পা. আনিসুজ্জামান]। অন্যপ্রকাশ, ঢাকা।

মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন (২০০৫)। কবর নাটকের স্বাতন্ত্র্য ও সাফল্য। *থিয়েটার*। [সম্পা. রামেন্দু মজুমদার]। ঢাকা।

মো. জাকিরুল হক (২০০৭)। *দুই বাংলার নাটকে প্রতিবাদী চেতনা*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

রফিকউল্লাহ খান (১৯৯৭)। *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

রফিকুল ইসলাম (১৯৮১)। *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম*। নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা।

রামেন্দু মজুমদার (১৯৮৮)। সম্পাদকের নিবেদন। *বাংলাদেশের নির্বাচিত নাটক*। [সম্পা. রামেন্দু মজুমদার]। মুক্তধারা, ঢাকা।

রাহমান চৌধুরী (২০০৭)। *রাজনৈতিক নাট্যচিন্তা ও স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের মঞ্চনাটক*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

রেজোয়ান সিদ্দিকী (১৯৯৬)। *পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

শওকত ওসমান (১৯৫২)। *বাগদাদের কবি*। কোহিনূর লাইব্রেরী, চট্টগ্রাম।

শেখ আকরাম আলী (১৯৮২)। *লাশ '৭৪*। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা।

সাঈদ আহমদ (১৯৭৬)। *সাঈদ আহমদের তিনটি নাটক* । বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

সুকুমার বিশ্বাস (১৯৯৮)। *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা* । বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

সেলিম আল দীন (১৯৮১)। *জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন* । বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

সেলিম মোজাহার (২০০৮)। *স্বাধীনতা-উত্তর ঢাকাকেন্দ্রিক মঞ্চনাটকে রাজনীতি ও সমাজবাস্তবতা*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯৯৬)। বহিপীর। *নাটকসমগ্র*। [সম্পা. হায়াৎ মামুদ]। প্রতীক, ঢাকা।

সৈয়দ শামসুল হক (১৯৯১)। *কাব্যনাট্য সংগ্রহ*। বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা।

সৈয়দা খালেদা জাহান (২০০৩)। *বাংলাদেশের নাটকে রাজনীতি ও সমাজসচেতনতা*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৭৩)। *সাহিত্য প্রসঙ্গ*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।